এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি

আবদুস শহীদ নাসিম

এসো
এক আল্লাহর
দাসত্ব করি

আবদুস শহীদ নাসিম

বি বি সি
বর্ণালি বুক সেন্টার

এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি

আবদুস শহীদ নাসিম

প্রকাশক
সেহেলী শহীদ
বর্ণালি বুক সেন্টার (বি.বি.সি)
মগবাজার, ঢাকা

পরিবেশনায়
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেছ রেলগেট
ঢাকা-১২১৭, ফোন : ৮৩১২৯২

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ১৯৯৯

কম্পোজ ও মুদ্রণ
আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা
ফোন : ৯৩৪৫৭৪১, ৪০৯২৭১

প্রচ্ছদ
আবুল হায়েক
মূল্য : ২০.০০ টাকা মাত্র

●

ASHO EK ALLAHR DASHOTTO KORI
(Come Let Us Worship Allah Only)
By. Abdus Shaheed Naseem, Published by
Seheli Shaheed, Bornali Book Center, Dhaka.
Ist Edition July 1999. Price Tk. 20.00 only.

বি বি সি : ৮

আগের কথা

মানুষ আর পশু এক নয়। পশু জ্ঞানার্জন করতে পারেনা, মানুষ পারে। মানুষের মতো বিবেক বুদ্ধিও পশুর নেই। মানুষ নিজের মেধা ও প্রতিভার বিকাশ সাধন করতে পারে, পশু পারেনা। মানুষ গবেষণা, উদ্ভাবন ও আবিস্কার করতে পারে, বিরাট বিরাট কাজ সম্পাদন করতে পারে। কিন্তু পশু এগুলো পারেনা। মানুষ উন্নতি সাধন করতে পারে, পশু পারেনা। মানুষ বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে বিচার বিবেচনা করে সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণ করতে পারে। পশু তা পারেনা। তাই মানুষ আর পশু এক নয়।

মানুষকে ভাবতে হবে, কে তাকে সৃষ্টি করেছেন? সৃষ্টিকর্তা কেন তাকে পশু না বানিয়ে মানুষ বানিয়েছেন? কেন তাকে বুদ্ধি, বিবেক ও যোগ্যতা দান করেছেন? এর পেছনে কি কোনো উদ্দেশ্য নেই?

যুক্তি ও বিবেক বলে এবং নবুয়্যতের নির্ভুল সূত্র থেকেও আমরা জানতে পারি, মানুষকে বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যেই তাকে জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেক দেয়া হয়েছে। সে উদ্দেশ্যটা হলো, মানুষ যেনো তার সৃষ্টিকর্তার সঠিক পরিচয় জেনে নেয়, তাঁর প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁর মর্জি মতো জীবন যাপন করে। সে যেনো কেবল তাঁরই দাসত্ব করে।

বিষয়টি এ বইতে খোলাখুলি আলোচনা করা হয়েছে। এসো বইটি পড়ে দেখি।

আবদুস শহীদ নাসিম

১২/৭/৯৮

বিষয় সূচি

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

এসো
এক আল্লাহর
দাসত্ব করি

● দাসত্ব করা মানুষের জন্মগত স্বভাব

'দাসত্ব' কথাটা শুনলে অনেকেরই গা জ্বলে উঠে। রাগে গোস্বায় রক্ত টগবগ করে। ঘৃণায় গতর ঘিন্ ঘিন্ করে। করবেই তো। কারণ, দাসত্বের জিঞ্জির থেকে মুক্তি পাবার জন্যে মানুষ সব সময়ই সংগ্রাম করেছে, এখনো করছে, ভবিষ্যতেও করবে। কার ইচ্ছে হয় মুক্ত পৃথিবীতে দাসত্ব করবার? দাস হয়ে জীবন যাপন করবার? বন্দী জীবনের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকবার?

হ্যাঁ ঠিকই, মানুষ দাসত্ব করতে চায়না। দাসত্বকে সে ঘৃণা করে। সে মুক্তি পাগল। সে চায় মুক্ত স্বাধীন জীবন। কিন্তু চাইলেই কি সব হয় ? হয়না, হতে পারেনা। কারণ, মানুষ তো নিজের স্রষ্টা নিজে নয়। সে অন্যের সৃষ্টি। তার স্রষ্টা তাকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, সে ঠিক সেরকম। তার স্রষ্টা তার মধ্যে যে স্বভাব প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অন্তরগত করে দিয়েছেন, সে কিছুতেই সে স্বভাব প্রকৃতি থেকে মুক্ত ও স্বাধীন হতে পারেনা।

তার স্রষ্টা তাকে সৃষ্টি করবার সময়ই তার মধ্যে দাসত্ব করবার স্বভাব প্রকৃতি অন্তরগত করে দিয়েছেন। 'দাসত্ব' শব্দটি ব্যাপক অর্থবহ । এর আরবি প্রতিশব্দ হলো 'আবদ' এবং 'ইবাদত'। এর প্রকৃত অর্থ হলো: কারো দাসত্ব করা, শৃংখলাবদ্ধ থাকা, হুকুম পালন করা, আনুগত্য করা, পূজা ও উপাসনা করা, তার নিকট বিনয়ী হয়ে থাকা, তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা এবং তার কাছে আরাধনা করা।

মানুষের মহান স্রষ্টা দাসত্বের এই গুণবৈশিষ্ট্যগুলো মানুষের স্বভাবগত করে দিয়েছেন। মানুষ কিছুতেই তার এই স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত ও স্বাধীন থাকতে পারেনা। তাই দাসত্ব তাকে করতেই হবে। এ থেকে কিছুতেই তার মুক্তি নাই, নিস্তার নাই।

● মানুষ কার দাসত্ব করবে?

হ্যাঁ, দাসত্ব মানুষকে করতেই হবে। সব মানুষই দাসত্ব করে। মানুষ জন্মগত ভাবেই দাস। কিন্তু প্রশ্ন হলো, মানুষকে কার দাসত্ব করা উচিত ?

এ প্রশ্নের জবাব দেবার আগে আমরা একটু মানুষের অবস্থা দেখে নিই। আমরা একটু দেখে নিই মানুষ কার কার দাসত্ব করে? আসলে মানুষ এতো অসংখ্য জিনিসের দাসত্ব করে যার হিসেব নিকেষ করা কঠিন। তবে মানুষ যেগুলোর দাসত্ব করে সেগুলোকে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। হ্যাঁ; মানুষ তার স্রষ্টাকে ছাড়া এসব শ্রেণীর দাসত্ব করে :

১. সে তার আত্মা তথা জৈবিক কামনা-বাসনা ও প্রবৃত্তির দাসত্ব করে।
২. কল্পিত কারো দাসত্ব করে।
৩. বংশ, গোত্র, সমাজ, সম্প্রদায়, স্বজাতি ও স্বদেশের পূজা করে।
৪. জাগতিক ক্ষমতাবানদের দাসত্ব করে।
৫. রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দাসত্ব করে।
৬. অর্থ সম্পদের পূজা করে।

মানুষ অন্যসব জীবের মতো নয়। অন্যসব জীবের প্রকৃতিতে স্রষ্টার দাসত্ব এবং জৈবিক চাহিদা ও কামনা-বাসনা পূরণের প্রবৃত্তি উভয়টাই সহজাত করে দেয়া হয়েছে। এটাই তাদের সৃষ্টিগত বা সহজাত প্রবৃত্তি। সৃষ্টিগত সীমাবদ্ধতার মধ্যে তারা কেবল নিজেদের এই প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ীই তাড়িত হয়। এর বাইরে অন্য কোনো তাড়া তাদের মধ্যে নেই।

কিন্তু মানুষের প্রকৃতি অন্যসব জীবের প্রকৃতির চাইতে ভিন্ন। তার স্রষ্টা তার সৃষ্টিগত প্রকৃতির মধ্যে দুটি জিনিস অন্তরগত করে দিয়েছেন। এর একটি হলো, অন্যসব জীবের মতো জৈবিক চাহিদা ও কামনা-বাসনা। আর অপরটি হলো জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেক। এই দ্বিতীয়টি অন্যান্য জীবকে দেয়া হয়নি। এই দ্বিতীয়টির ভিত্তিতে মানুষের প্রকৃতিতে সৃষ্টি হয় আরেকটি দাবি বা চাহিদা। সে দাবিকে বলা হয় যুক্তি, বুদ্ধি ও বিবেকের দাবি।

মানুষের এই দুটি দাবি ও চাহিদার মধ্যে প্রথমটি তার কাছে কেবল চায়, কেবল দাবি পেশ করে, কেবল উদগ্র কামনা-বাসনা পূরণের জন্য তাড়িত করে এবং দাবি, চাহিদা ও কামনা-বাসনার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বাধা-বন্ধন ও সীমা-রেখা মানতে সে চায় না। তার একটি দাবি মেনে নিলে, একটি কামনা পূরণ করলে সে আরেকটির জন্যে উদগ্র ও অজেয় হয়ে উঠতে চায়।

অপরদিকে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ তার অন্তরগত বিবেক বুদ্ধি প্রতিটি কামনা-বাসনা, চাওয়া-পাওয়া এবং দাবি ও চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে তাকে বিচার-বিবেচনা করতে বলে, ভেবে দেখতে বলে, চিন্তাভাবনা করতে বলে, ভালো

মন্দ যাচাই করতে বলে, ন্যায়-অন্যায় পরখ করে দেখতে বলে, সত্য মিথ্যা তলিয়ে দেখতে বলে, বাস্তবতা ও অবাস্তবতা খতিয়ে দেখতে বলে, উচিত-অনুচিত ভেবে দেখতে বলে, তার মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখতে বলে, তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ রাখতে বলে।

● মানুষ কিভাবে ভুল দাসত্বের পথে পা বাড়ায়?

মানুষ যখন দ্বিতীয়টির উপদেশ ও পরামর্শের প্রতি তোয়াক্কা না করে কেবল প্রথমটির দাবি ও চাহিদা পূরণ করতে থাকে, তখন তার অবস্থান হয় পাশবিক, বরং তখন সে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট ও অধম হয়ে যায়। তখন সে হয়ে পড়ে আত্মার দাস, জৈবিক কামনা-বাসনার নিকৃষ্ট দাস, পশুরও অধম প্রবৃত্তি পূজারী।

এ অবস্থায় বুদ্ধি, বিবেক, যুক্তি ও নৈতিক দাবিকে উপেক্ষা করে এবং চাপা দিয়ে মানুষ প্রথমে প্রবৃত্তির দাসত্ব শুরু করে। প্রবৃত্তি তার প্রভু হয়ে লাগামহীন ঘোড়ার মতো তাকে পিঠে তুলে ছুটে বেড়ায় বুদ্ধি বিবেকের নিষেধ করা প্রতিটি প্রান্তরে। অতপর দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকে তার প্রভু আর উপাস্যের সংখ্যা। তার বংশ, গোত্র, সমাজ, সম্প্রদায়, স্বজাতি ও স্বদেশ তার প্রভু হয়ে বসে। সে এগুলোর পূজা-উপাসনা করতে শুরু করে। অর্থ সম্পদকে সে শক্তিমান ও ক্ষমতাশালী মনে করে এবং প্রভু বানিয়ে নেয়। শুরু হয় অর্থ সম্পদের উপাসনা। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে প্রভু ও উপাস্য বানিয়ে নেয়। রাষ্ট্রকে দেবতা বানিয়ে নেয়। আবার কল্পনায় কাউকেও ক্ষমতাবান মনে করে তাকে খোদার আসনে বসিয়ে নেয়। হতে পারে সে কোনো মৃত ব্যক্তি, হতে পারে জীবিত ব্যক্তি, হতে পারে কোনো নক্ষত্র কিংবা হতে পারে অন্য কিছু।

এভাবে মানুষ তার বুদ্ধি বিবেক ও নৈতিকতার দাবিকে উপেক্ষা করার পর হাজারো প্রভু দাসত্বের আহবান নিয়ে তার সম্মুখে হাজির হয়। তাদের আহ্বানে সে প্রলুব্ধ হয়ে পড়ে। সে তাদের প্রভু বানিয়ে নেয়। অতপর শুরু হয় তাদের দাসত্ব করার। তাদের তাবেদারী করার, তাদের আনুগত্য করার, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান ও বিনয় প্রকাশ করার, তাদের পূজা-উপাসনা ও অর্চনা করার এবং তাদের কাছে আরাধনা ও প্রার্থনা করার।

এটা মানুষের জন্যে ভুল পথ। এটা জীবন যাপনের ভ্রান্ত পদ্ধতি। এটা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতি। এসব কিছুর দাসত্ব করার জন্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়নি। মানুষকে জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেক দিয়ে মর্যাদার যে শ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন

করা হয়েছে, এসব কিছুর দাসত্ব তাকে সে মর্যাদা থেকে নিচে নামিয়ে দেয়, নিকৃষ্ট বানিয়ে দেয়।

● মহাবিশ্ব ও বিশ্বপ্রকৃতির দিকে তাকাও

তাহলে মানুষকে কার দাসত্ব করা উচিত?

আমরা যদি বিবেক বুদ্ধির কাছে প্রশ্ন করি, তবে সহজেই এর উত্তর পেয়ে যাবো। এই মহাকাশ, এই মহাবিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখো, সেখানে রয়েছে হাজারো ছায়াপথ (Galaxy), সূর্যের চেয়ে বড় ছোট অযুত-কোটি নক্ষত্র! ওরা বেশি শক্তিশালী, নাকি মানুষ? এইযে সূর্য, তার চারপাশে ডজন খানেক গ্রহ, আবার তাদেরও কারো কারো আছে উপগ্রহ– ওরা বেশি বড় নাকি মানুষ?

এইসব নক্ষত্র (Star), গ্রহ (Planet), উপগ্রহ (Satellite) কার দাসত্ব করে? কার আনুগত্য তারা করে? কার হুকুমে তারা একই নিয়মে নিজ নিজ কক্ষপথে চলে? কার হুকুমে তারা কক্ষচ্যুত হয়না? কার নির্দেশে তারা চলার গতি পরিবর্তন করেনা? কার আদেশে তারা একে অপরকে আঘাত করেনা? কে সৃষ্টি করেছেন মধ্যাকর্ষণ শক্তি? কার হুকুমে সে শক্তি তার অবস্থান পরিবর্তন করেনা? কার হুকুমে দিনের পর রাত, রাতের পর দিন আসে?- ওরা সবাই কার হুকুম পালন করে? কার দাসত্ব করে তারা ?

এসব প্রশ্নের জবাবে নিশ্চয়ই তোমার বিবেক বলে উঠবে: ওরা সবাই তাদের সৃষ্টিকর্তার দাসত্ব করে, কেবল তাঁরই হুকুম মতো তারা চলে। তারা কেবল তাঁরই বিধান মতো চলে। কখনো তারা লংঘন করেনা তাদের মহান সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও প্রভুর বিধান। তারা তাঁর বিধানের অনুগত। অত্যন্ত বিনীতভাবে তারা কেবল তাঁরই দাসত্ব করে।

এমনিভাবে গোটা বিশ্বজগতের যে কোনো কিছুর প্রতিই লক্ষ্য করো দেখবে, সকলেই তাদের মহান সৃষ্টিকর্তা এক আল্লাহর বিধান মতো চলছে। বিনীতভাবে সবাই তাঁরই দাসত্ব করছে। বাতাস, পানি, মাটি, আগুন সবাই স্রষ্টার বিধান মতো চলছে এবং তাঁরই হুকুম মতো কাজ করছে। তাদের কেউই তার জন্যে নির্ধারিত নিয়ম ও বিধান পরিত্যাগ করেনা এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থেকেও হয়না বিচ্যুত।

পশু, পাখিসহ সকল জীবজন্তু তাদের প্রত্যেক প্রজাতির জন্য নির্ধারিত বিধান মেনে চলে। তাদের কেউই অপর কারো দাসত্ব করেনা। তাদের

প্রত্যেকেই আল্লাহ্ নির্ধারিত প্রাকৃতিক বিধানের অনুসারী। তারা কেবল আল্লাহরই দাসত্ব করে।

যমীনের বুক থেকে হাজারো রকম তরুলতা, বৃক্ষরাজি গজিয়ে উঠে। এদের প্রত্যেকেই মহান সৃষ্টিকর্তার নির্ধারিত বিধান মেনে চলে।

আমরা একই মাটিতে আম, আংগুর, আপেল, আমড়া, আনারস, কলা, কমলা, বরই, পেয়ারা, জাম, লিচু লাগাই। ওরা একই মাটির রস, একই সূর্যের আলো, এবং একই বাতাসের বদৌলতে বড়ে উঠে। তারপর কি দেখতে পাই?

আমরা সববাই দেখি, ওরা কেউই নিজেদের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করেনা। নিজেদের জন্য নির্ধারিত বিধান থেকে কেউ-ই বিচ্যুত হয়না। তাদের প্রত্যেকের ডাল-পাতা-শাখার আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। ফল দেয়ার সময় হলে আম গাছে আম ফলে, আংগুর গাছে আংগুর, আপেল গাছে আপেল, আমড়া গাছে আমড়া, আনারস গাছে আনারস, কলা গাছে কলা, কমলা গাছে কমলা, বরই গাছে বরই, পেয়ারা গাছে পেয়ারা, জাম গাছে কালো কালো জাম, লিচু গাছে লিচু, লেবু গাছে লেবু। ওদের প্রত্যেকের ফলের বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র , স্বাদে ভিন্ন ভিন্ন। ওরা প্রতেকেই নিজের ফল নিজে দেয়। কেউই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেয়না। তারা এক আল্লাহর বিধান মেনে চলে। কেবল তাঁরই দাসত্ব করে, শুধু তাঁরই হুকুম মতো চলে। তাঁরই দেয়া নিয়মের অনুসারী থাকে।

উপরে যাদের কথা বললাম, তারা এবং অন্য কেউই নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেয়না, স্রষ্টার নির্ধারিত বিধান থেকে বিচ্যুত হয়না। এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো দাসত্ব তারা করেনা।

● মানুষের দেহটাও আল্লাহর দাসত্ব করে

আমরা যদি নিজেদেরই শরীরের দিকে তাকাই, যদি সূক্ষ্মভাবে প্রত্যক্ষ করি আমাদের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তাহলে কী দেখি? স্পষ্ট ভাবেই আমরা দেখতে পাই আমাদের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গই মহান স্রষ্টার দাসত্বে নিয়োজিত। আল্লাহ আমাদের চোখ দিয়েছেন দেখার জন্যে, কান দিয়েছেন শোনার জন্যে, নাক দিয়েছেন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ঘ্রাণ নেয়ার জন্যে, মুখ দিয়েছেন খাবার জন্যে, জিহ্বা দিয়েছেন কথা বলার জন্যে ও স্বাদ নেবার জন্যে, পা দিয়েছেন হাঁটার জন্যে, হাত দিয়েছেন ধরার জন্যে, কাজ করার জন্যে। আমাদের এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো স্রষ্টা নির্ধারিত কাজই করে যাচ্ছে নিরলসভাবে। তুমি যদি তোমার

এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা স্রষ্টা নির্ধারিত কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজ করাতে চাও, তাহলে দেখবে সেগুলো বিকল হয়ে যাচ্ছে।

একইভাবে আমাদের মস্তিস্ক, ফুসফুস, যকৃত, কিডনী, হৃৎপিন্ড, ভাল্ব, মেরুদণ্ড, ঘাড়, গলা, হাঁটু কনুই, বাহু, শিরা, উপশিরা সবাই স্রষ্টার নির্দেশ মতো কাজ করছে। স্রষ্টার নির্ধারিত প্রাকৃতিক বিধান তারা মেনে চলছে। আমরা তাদের জন্য নির্ধারিত প্রাকৃতিক বিধানের বিপরীত কোন কাজ তাদের দিয়ে করাতে পারবনা। করাতে গেলেই তারা বিকল হয়ে যাবে। আমরা যদি চোখ দিয়ে শুনতে, কান দিয়ে দেখতে, মুখ দিয়ে মলত্যাগ করতে, নাক দিয়ে প্রস্রাব করতে, মস্তিস্ক দিয়ে ফুসফুসের কাজ করতে, পা দিয়ে খেতে, হাত দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে চাই, তাহলে দেখবো আমাদের শরীরের এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো আমাদেরই কথা শুনছেনা। ওরা বেঁকে বসবে। কারণ ওরাতো আমাদের দাসত্ব করেনা। ওরা দাসত্ব করে ওদের স্রষ্টার, এক আল্লাহর।

● বিশ্ব প্রকৃতির সাথে আমাদের দেহ সত্তার মিতালি

আমরা দেখতে পেলাম আমাদের গোটা দেহ, দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেবল এক আল্লাহর দাসত্ব করে, কেবল তাঁরই হুকুম ও বিধান মেনে চলে। যেমন মেনে চলে মহাবিশ্বের সমস্ত নক্ষত্ররাজি, সূর্য, শুক্র, শনি, রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ বৃহস্পতি, নেপচুন, প্লুটো, ইউরেনাস, পৃথিবী, চাঁদ, পশুপাখি, এবং তরুলতা-বৃক্ষরাজি।

কী চমৎকার! গোটা বিশ্বপ্রকৃতির সাথে আমাদের দেহ ও অংগ-প্রত্যংগের কতো সুন্দর মিল! তারা সকলেই তাদের মহান সৃষ্টিকর্তা এক আল্লাহর দাস। তারা সবাই কেবল তাঁরই হুকুম মেনে চলে, কেবল তাঁরই হুকুম মতো চলে। কী চমৎকার মিতালি তাদের মাঝে!

এতোক্ষণ যে বিধানের কথা বললাম, সেটা মহান স্রষ্টা আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান। মহাবিশ্বের সব কিছু তাঁর প্রাকৃতিক বিধানের অধীন। তিনি যার জন্যে যে নিয়ম ও বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, সে কেবল সেই নিয়ম ও বিধানের অধীনই চলছে। এমনকি আমাদের দেহ এবং দেহের প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগ সেই নিয়ম ও বিধানেরই অধীন। এদের কেউই আল্লাহর নির্ধারিত প্রাকৃতিক নিয়ম ও বিধান লংঘন করেনা, করতে পারেও না।

● মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা

মানুষের সমস্ত দেহটাকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রাকৃতিক বিধানের অধীন করে দিয়েও তার মধ্যে একটা স্বাধীন জিনিস দিয়েছেন। সেটা হলো, তিনি মানুষকে 'ইচ্ছার' স্বাধীনতা দিয়েছেন। ইচ্ছার স্বাধীনতা মানে, যেকোনো ব্যাপারে পছন্দ অপছন্দের স্বাধীনতা, গ্রহণ বর্জনের স্বাধীনতা, মতামতের স্বাধীনতা, হাঁ-না করার স্বাধীনতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা।

তাহলে আমরা দেখতে পেলাম, মানুষকে মহান আল্লাহ্ দুটি জিনিস দিয়েছেন। একটি হলো তার দেহ, আর অপরটি তার মন বা ইচ্ছা। প্রথমটিকে মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রাকৃতিক আইনের অধীন করে দিয়েছেন আর শেষেরটিকে করে দিয়েছেন স্বাধীন।

মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ইচ্ছার (Choice) স্বাধীনতা দিয়ে তাকে বিরাট পরীক্ষায় ফেলেছেন। একদিকে তিনি তাকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন, অপরদিকে তার জীবন যাপনের জন্যে আলাদা আইনও বিধান পাঠিয়েছেন। সেই সাথে বলে দিয়েছেন, আমার পাঠানো বিধান অনুযায়ী যদি তুমি জীবন যাপন করো, তবে আমার কাছে রয়েছে তোমার জন্যে বিরাট পুরস্কার। আর যদি আমার দেয়া বিধান অমান্য করে নিজের মনগড়া বা অন্য কারো মনগড়া পদ্ধতিতে জীবন যাপন করো, তবে অবশ্যি আমি তোমাকে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করবো।

এটা মানুষের জন্য বিরাট পরীক্ষা। আগেই বলেছি, এই জগতে মানুষ অনেক কিছুকে খোদা বানিয়ে রেখেছে। সে সেগুলোর হুকুম মেনে চলে, আনুগত্য করে, নিয়মপ্রথা অনুসরণ করে, সেগুলোর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করে, তাদের কাছে প্রার্থনা ও আরাধনা করে। এভাবে সে এসব জাগতিক খোদার দাসত্ব করছে।

অপরদিকে আল্লাহ্ মানুষের জন্যে বিধান পাঠিয়ে সে অনুযায়ী জীবন যাপন করতে বলেছেন এবং কেবলমাত্র তাঁরই দাস হয়ে থাকতে বলেছেন। এর ফলে সে আল্লাহর কাছে পুরস্কার লাভ করবে। অন্যথায় ভোগ করতে হবে কঠিন শাস্তি। তবে যে কোনো পথ অবলম্বন করাটা তিনি মানুষের ইচ্ছাধীন করে দিয়েছেন।

এখন কোন্ পথ মানুষ অবলম্বন করবে?

● বিবেকের কাছে প্রশ্ন করো

এ ব্যাপারে আগেই বলেছি, মহান আল্লাহ মানুষকে কেবল ইচ্ছার স্বাধীনতাই দেননি, সেই সাথে বিবেক বুদ্ধিও দান করেছেন। ভালো মন্দ, লাভ ক্ষতি, কল্যাণ অকল্যাণ ভেবে দেখার ক্ষমতাও দান করেছেন।

তাই আমাদের উচিত আমাদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করা, কার আইন মেনে চলা আমাদের জন্য উত্তম? কার বিধানের অনুসরণ করা আমাদের জন্য লাভজনক? কার আনুগত্য ও হুকুম মেনে চলা আমাদের জন্য কল্যাণকর? কার দাসত্ব করা আমাদের জন্য মর্যাদা ব্যঞ্জক ও চিরসুখী হবার উপায়? হ্যাঁ, এসো আমরা বিবেকের কাছে জিজ্ঞাসা করি। বুঝাপড়া করে জেনে নিই বিবেকের ফায়সালা কোন্‌টি?

খাদীজা, সুমাইয়া, উম্মে সালমা, আসমা, আয়শা, যয়নব, যায়েদ, জাবির, উমর, আবু বকর, সা'আদ, সায়ীদ, সালেম, বেলাল, ইয়াসির, আম্মার, খাব্বাব, সালমান, আবু যর, হাসানুল বান্না, সাইয়েদ কুতুব, হামিদা কুতুব, যয়নব আল গাজালী, সাইয়েদ মওদূদী, ইসমাঈল ফারুকী, আব্দুল মালেক এঁরা সকলেই তাদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন। তাই এসো, আমরাও আমাদের বিবেককে জিজ্ঞেস করি।

● বিবেক বুদ্ধির রায়

বিবেক বুদ্ধি সবাইকে একই রায় দেয়। আমাদের সবার বিবেক বুদ্ধির সেই রায় হলো, মানুষের উচিত তার মহান স্রষ্টা, মালিক, প্রতিপালক, প্রভু এক আল্লাহর আইন ও বিধান মেনে চলা এবং কেবল তাঁরই দাসত্ব করা। কারণ তিনিই তো আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের প্রিয় বাবা-মাকে সৃষ্টি করেছেন, সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এই পৃথিবী, এই মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন। তাই মহান স্রষ্টা ছাড়া আর কারো দাসত্ব করা আমাদের উচিত নয়।

গোটা মহাবিশ্ব, এই পৃথিবী, পৃথিবীর সবকিছু, আর আমাদের গোটা দেহ, দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যার বিধান মেনে চলছে, আমাদের ইচ্ছাকেও কেবল তাঁরই আইন ও বিধানের অধীন করা উচিত। কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি চাওয়া আমাদের কর্তব্য। কেবল তাঁরই দাসত্ব করা আমাদের দায়িত্ব।

বিবেক বুদ্ধি বলে, যিনি আমাদের জীবন দান করেছেন, বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করেছেন, আমাদেরকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন, জ্ঞান, বুদ্ধি বিবেক দিয়েছেন, চিন্তা করার শক্তি দিয়েছেন, দেহের

প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আমাদের অধীন করে দিয়েছেন, পৃথিবীর সমস্ত কিছুকে আমাদের অনুকূল ও সহায়ক বানিয়ে দিয়েছেন, আমাদের তো উচিত কেবল তাঁরই অনুগত ও অধীন থাকা। কেবল তাঁরই ইবাদত ও উপাসনা করা, কেবল তাঁরই দেয়া বিধান মতো জীবন যাপন করা, কেবল তাঁরই দাসত্ব করা, কেবল তাঁরই মর্জিমতো চলা।

এটাই আমাদের সকলের বিবেক বুদ্ধির রায়। এটাই যুক্তির দাবি। আমরা বিবেকের এই রায় এবং যুক্তির এই দাবি যদি মেনে নিই, তবেই আমরা গোটা মহাবিশ্বের সাথে একাত্ম হতে পারি। গোটা মহাবিশ্ব, মহাবিশ্বের মাঝে অবস্থিত সব কিছু, এই সূর্য, এই চাঁদ, এই পৃথিবী, পৃথিবীর সবকিছু, সব প্রাণী, আমাদের গোটা দেহ, দেহের প্রতিটি অংগ প্রত্যংগ, অণূ-পরমাণু সবাই যেভাবে এক আল্লাহর দাসত্ব করছে, তেমনি আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিকেও যদি আমরা তাঁরই অনুগত বানাতে পারি, তাঁরই দাস বানাতে পারি, তবেই তো আমরা গোটা মহাবিশ্ব এবং মহাবিশ্বের সব কিছুর সাথে একাত্ম হতে পারলাম। আমাদের সৃষ্টিগত স্বভাব প্রকৃতির এটাই দাবি। বিশ্বজগতে কার্যকর আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধানেরও এটাই দাবি।

● মানুষের কল্পিত উপাস্য

সেই আদিম ও প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ বিশ্ব স্রষ্টার সন্ধান করেছে। পূরা কালের যা কিছু তথ্য ও নিদর্শন পাওয়া যায়, তা থেকে সহজেই জানতে পারা যায়, মানুষ সব সময়ই কারো না কারো পূজা উপাসনা এবং আনুগত্য ও দাসত্ব করেছে। শক্তিমানের কাছে মাথা নুইয়ে দিয়েছে। বিনয় ও মিনতি প্রকাশ করেছে এবং আরাধনা ও প্রার্থনা করেছে।

সব যুগেই মানুষ স্রষ্টার সন্ধান করতে গিয়ে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছে। কখনো চন্দ্র,সূর্য ও গ্রহ নক্ষত্রকে বড় মনে করে সেগুলোর উপাসনা করেছে। অথবা অন্য কোনো কিছুকে শক্তিমান মনে করে তার কাছে নত হয়েছে।

অনেকে আবার দুই ধরনের দেবতায় বিশ্বাস করেছে– মংগলের দেবতা ও অমংগলের দেবতা। কেউ কেউ খোদার স্ত্রী পুত্র আছে বলেও কল্পনা করে।

অনেকে আবার বিশ্ব স্রষ্টার গুণাবলীকে বিভিন্ন কল্পিত উপদেবতার মধ্যে ভাগ বন্টন করে সেসব কল্পিত দেবতার পূজা অর্চনা করে। তারা মনে করে এসব দেবতাকে খুশি করতে পারলেই বিশ্ব স্রষ্টাকে খুশি করা যাবে।

● কল্পিত উপাস্যরা যুক্তিতে টেকেনা

এসবই ভুল। কারণ কাল্পনিক জিনিস সত্য হতে পারেনা। সত্য পাওয়া যায় বিবেক বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে এবং বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে।

আমাদের বুদ্ধি ও যুক্তি পরিষ্কার করে আমাদের বলে, গ্রহ নক্ষত্র ও চন্দ্র সূর্য কিছুতেই মানুষের উপাস্য হতে পারেনা। কারণ তারা তো একই বাঁধাধরা নিয়মের অধীনে চলছে। ওদের কোনো স্বাধীনতা নেই। ওরা কিছুতেই নিজেদের কক্ষপথ থেকেও নড়তে পারেনা, নড়লেই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাছাড়া ওরা মানুষের প্রার্থনাও শুনতে পায়না। নিজেদের ধরাবাঁধা নিয়মের বাইরে ওরা কিছুই করতে পারেনা। তাহলে কেমন করে ওরা উপাস্য হতে পারে? কেমন করে হতে পারে ওরা মানুষের দেবতা? পরিষ্কার বুঝা যায়, ওদের কেউ সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সৃষ্টিকর্তার নির্ধারিত নিয়মের ওরা অধীন।

বিশ্ব স্রষ্টা দুজনও হতে পারেননা। এটা যুক্তিতে খাটেনা। কারণ, একজনের হাতে যদি মংগল থাকে আর আরেকজনের হাতে যদি থাকে অমংগল, তবে তারা দুজনই অচল হয়ে যাবে। একজন মংগলের কাংগাল হবে, আরেকজন হবে অমংগলের কাংগাল। এ নিয়ে তারা ঝগড়ায় লিপ্ত হতে বাধ্য, অবশেষে ধ্বংস হতেও বাধ্য। তাছাড়া উপাস্য দেবতা কখনো অপূর্ণ হতে পারেনা, কোনো কিছুর জন্যে একজন আরেকজনের মুখাপেক্ষী হতে পারেনা। খোদার স্ত্রী এবং সন্তানও থাকতে পারেনা। কারণ তাহলেও তিনি প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন।

অন্য দিকে বিশ্ব স্রষ্টার গুণাবলী যদি বিভিন্ন দেবতার মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে দেয়া হয়, যদি কাউকেও ভাগ্যের দেবতা মানা হয়, কাউকেও যদি মানা হয় বৃষ্টির দেবতা, কাউকেও খরার দেবতা, কাউকেও জীবিকার দেবতা, কাউকেও মৃত্যুর দেবতা, কাউকেও জীবনের দেবতা-এভাবে ভাগ বাটোয়ারা করে দিলে প্রত্যেক দেবতাই আরেক দেবতার মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য হবে। তারা একজন আরেকজনের সাহায্য ছাড়া বেঁচে থাকতে পারবেনা।

তাছাড়া বিশ্বস্রষ্টার সাথে যদি অন্য কাউকেও উপদেবতা মানা হয়, যদি কাউকে জগত পরিচালনায় তার সংগি সাথি, সহযোগী-সাহায্যকারী ও অংশীদার মানা হয়, তবে তো ধরেই নিতে হবে তিনি মহাবিশ্ব পরিচালনায় সম্পূর্ণ অক্ষম। কারণ, কারো সাহায্য ও সাথিত্ব ছাড়া যিনি জগত চালাতে পারেন না- তিনি অক্ষম নয়তো কি? তিনি অবশ্যি মানুষের মতো অক্ষম।

মানুষের বিবেক বুদ্ধি ও যুক্তি এসব কল্পিত দেবতাদের কিছুতেই সমর্থন করতে পারেনা। মানুষের বুদ্ধি ও যুক্তির কাছেই তারা পরাজিত। তাদের উপাস্য দেবতা হবার তো প্রশ্নই উঠেনা।

● একটু ভেবে দেখো

একটু চিন্তা করো। চিন্তা করলেই তোমার বিবেক বুদ্ধি পরিষ্কার করে তোমাকে বলে দেবে :

১. মানুষ, এই পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য এবং গোটা মহাবিশ্বের একজনই সৃষ্টিকর্তা হওয়া উচিত। তা না হলে তো প্রত্যেকেই নিজ নিজ সৃষ্টি ভাগ বাটোয়ারা করে নিতো। নিজের সৃষ্টিতে নিজের নিয়ম চালু করতো। নিজের সৃষ্টির দখলদারিত্ব নিয়ে হৈ হাংগামা সৃষ্টি করে ধ্বংস হয়ে যেতো।

২. মানুষ, পৃথিবী ও গোটা মহাবিশ্বের একজনই মালিক, মনিব, পরিচালক, সম্রাট ও কর্তৃত্ববান্ হওয়া উচিত। একাধিক হলে তাদের কর্তৃত্বের লড়াইতে সবই ধ্বংস হয়ে যেতো।

৩. জীবন দাতা, মৃত্যুদাতা, জীবিকা দাতা, কল্যাণকারী, অকল্যাণকারী, প্রার্থনা শ্রবণকারী, বিপদ দূরকারী, বৃষ্টি দানকারী, সন্তান দানকারী ইত্যাদি সকল কিছুর চাবিকাঠি একজন প্রভুর হাতেই থাকাই উচিত। প্রতিটি জিনিসের জন্যে আলাদা আলাদা দেবতাকে খুশি করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সবকিছু এবং সব প্রয়োজনের জন্যে একজন প্রভুর মুখাপেক্ষী হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

৪. গোটা মহাবিশ্ব এবং মহাবিশ্বের সব প্রাণী ও সব কিছুর একজনই প্রতিপালক ও পরিচালক হওয়া উচিত। তা না হলে তো সবকিছু লন্ডভন্ড হয়ে যেতে বাধ্য, বিশৃংখলা দেখা দিতে বাধ্য।

৫. গোটা মহাবিশ্ব, এই পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে, আমরা দেখছি, এসবই সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীন চলছে। পরিচালনার ক্ষেত্রে কোথাও কোনো অনিয়ম নেই, বিশৃংখলা নেই, সংঘর্ষ নেই, টানা হেঁচড়া নেই, বাদানুবাদ নেই, ঝগড়া-ঝাটি নেই, কোথাও কোনো নিয়ম ও প্রাকৃতিক বিধানের কোনো প্রকার ব্যতিক্রম নেই। ফলে যুক্তি, বুদ্ধি ও বিবেক স্বত:স্ফূর্তভাবেই সাক্ষ্য দেয়, গোটা বিশ্বজাহানের মালিক ও পরিচালক একজনই হওয়া উচিত। সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব একজনের হাতে থাকলেই কেবল সবকিছু নিয়ম মাফিক ও সুশৃংখলভাবে চলতে পারে। একাধিক

কর্তৃত্বকারীর নির্দেশে কিছুতেই সবকিছু কোটি কোটি বছর ধরে সৃশংখলভাবে চলতে পারেনা।

৬. খোদার স্ত্রী থাকলে তাকেও দেবী বা ইশ্বরী হতে হবে। সেই স্ত্রী যদি খোদার সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে সে খোদার স্ত্রী হবার যোগ্যতা রাখেনা। আর যদি স্বসৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে সে নারী হতে যাবে কেন? আরেকজনের স্ত্রী হতে যাবে কেন? সুতরাং বিশ্ব স্রষ্টার স্ত্রী থাকার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

৭. একইভাবে বিশ্ব স্রষ্টার সন্তানও থাকতে পারেনা। থাকলে প্রশ্ন দেখা দিবে তারা কার সৃষ্টি? তারা স্বসৃষ্ট, নাকি বিশ্ব স্রষ্টার সৃষ্টি? স্বসৃষ্ট হলে তারা আরেকজনের সন্তান হতে যাবে কেন? আর বিশ্ব স্রষ্টার সৃষ্টি হলে তাদের তো আর কোনো খোদায়ী বৈশিষ্ট্য থাকলোনা। কারণ মহাবিশ্বের সব কিছুই তো বিশ্ব স্রষ্টার সৃষ্টি। আর তাঁর সৃষ্টি মানেই তাঁর দাস।

● নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের সাক্ষ্য

এতোক্ষণ আমরা কথা বলেছি বিবেক বুদ্ধির ফয়সালা সম্পর্কে। আমরা ভেবে দেখেছি, আমাদের বিবেক বুদ্ধি বলে, এই পৃথিবী এবং গোটা মহাবিশ্ব এমনি এমনি সৃষ্টি হয়নি। অবশ্যি কোনো মহাজ্ঞানী, মহবিজ্ঞ ও মহাকৌশলী স্রষ্টা এগুলো সৃষ্টি করেছেন। আমাদের যুক্তি বুদ্ধি একথাও সাক্ষ্য দেয় যে, সেই মহান স্রষ্টাকে অবশ্যি এক ও অদ্বিতীয় হওয়া উচিত।

একগুলো আমাদের বিবেক বুদ্ধির সাক্ষ্য। কিন্তু সেই মহান সৃষ্টিকর্তার পরিচয় আমরা জানিনা। সরাসরি তাঁকে জানার কোনো উপায় আমাদের নেই।

আমাদের বিবেক বুদ্ধি বলে, আমাদের উচিত কেবল মাত্র সেই এক ও একক সৃষ্টিকর্তার দাসত্ব করা, কেবল তাঁরই আনুগত্য করা, কেবল তাঁরই হুকুম মেনে চলা, কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি অনুযায়ী জীবন যাপন করা।

অথচ না জানলে কিভাবে আমরা তাঁর দাসত্ব করবো? কিভাবে তাঁর আনুগত্য করবো? কিভাবে তাঁর হুকুম মেনে চলবো? কিভাবে জানবো কোন্‌টি তাঁর সন্তুষ্টির পথ আর কোনটি তাঁর অসন্তুষ্টির?

আমাদের বিবেক বুদ্ধি বলে, এগুলো জানার জন্যে আমাদের এমন ব্যক্তিদের দারস্থ হওয়া উচিত, যাঁরা নিজেরা একেবারে দিবালোকের মতো বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য এবং যারা সত্য সঠিক ও বিশ্বস্ত সূত্রে মহান সৃষ্টিকর্তার পরিচয় জানতে পেরেছে, তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছা, হুকুম বিধান ও তাঁর দাসত্ব করার

পদ্ধতি জানতে পেরেছে। আমাদের বিবেক আরো বলে, এ ধরনের লোকদের মাধ্যমে আমরা যে জ্ঞান ও তথ্য পাবো, তাও আমাদের বিবেক বুদ্ধির কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে।

যেমন দুই প্রতিবেশীর মাঝে বিবাদ বাধলে মীমাংসার জন্যে আমরা মাতাব্বরের কাছে যাই। হৃদ রোগে আক্রান্ত হলে মাতাব্বরের কাছে না গিয়ে কার্ডিওলজিস্ট-এর কাছে যাই। আইনগত সহায়তার প্রয়োজন হলে ডাক্তারের কাছে না গিয়ে উকিলের কাছে যাই। তেমনি বিশ্বজগতের স্রষ্টার পরিচয় ও ইচ্ছা-অনিচ্ছা জানতে হলে আমাদেরকে এমন ব্যক্তিদের দারস্থ হতে হবে, যারা ছাড়া এ ব্যাপারে অন্য কারো জ্ঞান নেই।

হ্যাঁ, এমন ব্যক্তিরা হলেন নবী ও রসূল। 'নবী মানে 'সংবাদ বাহক' আর রসূল মানে বার্তাবাহক'। নবীগণ মানুষ ছিলেন। সব নবীই নবী হবার পূর্বে–

– সমাজের সবচাইতে ভালো মানুষ ছিলেন।

– সবচেয়ে সত্যবাদী মানুষ ছিলেন।

– সবচে' বিশ্বস্ত, আমানতদার ও নির্ভরযোগ্য মানুষ ছিলেন।

– সবার চেয়ে পবিত্র নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

– সবচেয়ে বড় ন্যায় পরায়ণ ও সত্যপন্থী ছিলেন।

– সর্বাধিক মানবদরদী, কল্যাণকামী ও হিতাকাংখী ছিলেন।

– সবার চেয়ে সুস্থ বিবেক বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন।

– শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণাবলীর কারণে সর্বাধিক খ্যাতিমান ছিলেন।

বিশ্বজগতের মালিক মহান আল্লাহ্ এমন ব্যক্তিদেরই তাঁর নবী ও রসূল নিযুক্ত করেছেন। পৃথিবীর সব মানুষের কাছেই আল্লাহ নবী-রসূল পাঠিয়েছেন। পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম আ. ছিলেন আল্লাহর প্রথম নবী। ৫৭১ খৃষ্টাব্দে আরবের মক্কা নগরীতে জন্ম গ্রহণকারী মুহাম্মদ সা. আল্লাহর শেষ নবী। কালের বিবর্তণে মানুষ লেখা ও ভাষা সংরক্ষণের ব্যবস্থা আয়ত্ত্ব করতে শিখেছে। ফলে মুহাম্মদ সা.-এর নিকট আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর যে বাণী অবতীর্ণ করেছেন, তা চিরকালের জন্যে সুরক্ষিত থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কোনো মানুষের পক্ষেই তা আর পৃথিবী থেকে মুছে ফেলা কিংবা বিকৃত করা সম্ভব নয়। তাই মুহাম্মদ সা.-এর পর পৃথিবীতে আর কোনো নবী আসার প্রয়োজন নেই। তাঁকেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সর্বশেষ নবী বলে ঘোষণা করেছেন।

আদম আ. থেকে নিয়ে মুহাম্মদ সা. পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে নবী নিযুক্ত করেছেন। তাঁদের সংখ্যা লক্ষাধিক। তাঁরা প্রত্যেকেই মানুষের কাছে একই রকম কথা বলেছেন। একটা বিশেষ বয়েসে নবুয়্যত লাভ করার পর তাঁদের প্রত্যেকেই মানুষকে বলেছেন ঃ

"–বিশ্বজগতের মালিক মহান আল্লাহ আমার কাছে তাঁর বাণী পাঠিয়েছেন, আমাকে তাঁর নবী নিযুক্ত করেছেন।

- তিনি জানিয়েছেন, তাঁর স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়স্বজন ও সমকক্ষ কেউ নাই।
- সকলেই এবং সবকিছুই তাঁর সৃষ্টি এবং সৃষ্টিগত দাস।
- সবকিছুই তাঁর বেঁধে দেয়া নিয়ম ও বিধানের অধীন চলছে।
- তিনিই গোটা মহাবিশ্বের স্রষ্টা, মালিক, শাসক, প্রভু, পরিচালক, প্রতিপালক ও নিয়ন্ত্রক।
- তাঁর ক্ষমতার কাছে সবাই অসহায়।
- তিনি মানুষকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং জীবন যাপনের জন্যে দুটি পথ বানিয়ে দিয়েছেন। একটি ধ্বংস ও অকল্যাণের পথ, আরেকটি মুক্তি ও কল্যাণের পথ।
- আমাকে নবী নিযুক্ত করে আমার মাধ্যমে তিনি মানুষের জীবন যাপনের বিধান পাঠিয়েছেন। তাঁর দেয়া বিধান মতো জীবন যাপন করাই মুক্তি ও কল্যাণের উপায়।
- মৃত্যুর পর তিনি সব মানুষকে পুণরায় জীবিত করবেন। সেটা হবে মানুষের পরকাল। পৃথিবীর জীবনে মানুষ আল্লাহর বিধানমতো জীবন যাপন করেছে কিনা সেখানে সেই বিচার করা হবে।

– তিনি সকলের জন্যে সুবিচার করবেন। বিচারে যার ব্যাপারে প্রমানিত হবে, সে আল্লাহর পাঠানো বিধান এবং নবীদের দেখানো পথে জীবন যাপন করেছে, তাকে মনোরম উদ্যানে নির্মিত পরম সুখের প্রাসাদসমূহে বসবাস করতে দেয়া হবে। সেখানে থাকবে সব ধরনের উপভোগ্য সামগ্রীর সীমাহীন সরবররাহ। সেখানে সে যা চাইবে, তাই পাবে। চিরকাল তাকে সেই সুখ ও সম্ভোগের মাঝে থাকতে দেয়া হবে।

–বিচারে যারা আল্লাহর বিধান এবং নবীদের দেখানো পথে জীবন যাপন করেনি বলে প্রমাণিত হবে, তাদের নিক্ষেপ করা হবে দাউ দাউ করে জ্বলা

আগুণের গহ্বরে। সেখানে তাদের জন্যে থাকবে কঠিন থেকে কঠিন শাস্তির (Torment) ব্যবস্থা। প্রচন্ড শাস্তি দেয়া হবে, কিন্তু জীবিত রাখা হবে, যাতে করে তাদের চিরকাল শাস্তি দেয়া যায়।

– সুতরাং হে মানুষ! তোমরা কেবল এক আল্লাহর দাসত্ব করো এবং আমার কথা মেনে নাও।"

প্রত্যেক নবীই মানুষকে এই মৌলিক কথাগুলো বলেছেন। আল কুরআন আল্লাহর কিতাব বলে সুপ্রমাণিত। তুমি এই মহাগ্রন্থ পড়ে দেখো।

দেখবে, নবীগণ মানুষকে কি কি কথা বলেছেন, সবই এতে উল্লেখ আছে। আদম, ইদরীস, নূহ, সালেহ, হুদ, শুয়াইব, লূত, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসুফ, মূসা, হারূণ, দাউদ, সুলাইমান, ইউনুস, ইলিয়াস, আইউব, যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা (তাঁদের প্রতি শান্তি ও করুণা বর্ষিত হোক) সকলেই মানুষ ও বিশ্বজগতের সৃষ্টি সম্পর্কে একই রকম কথা বলেছেন এবং মানুষকে একই আহ্বান জানিয়েছেন। তারা কি কি বলেছেন তা একটু আগেই আমরা উল্লেখ করেছি।

তাঁরা বিশ্বজগতের সৃষ্টি, প্রতিপালন ও পরিচালনা সম্পর্কে যেসব তথ্য দিয়েছেন, সবই আমাদের বিবেক বুদ্ধির রায়ের সাথে মিলে যায়। তাঁরা মহান স্রষ্টার প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, তাছাড়া পরকালীন জীবন এবং শাস্তি ও পুরস্কার সম্পর্কে যে সংবাদ দিয়েছেন, সবই বাস্তব ও যুক্তিসংগত বলে আমাদের বিবেক সাক্ষ্য দেয়।

সুতরাং এই নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের আহ্বান মেনে নেয়া ছাড়া সঠিক পথে চলার আর কোনো উপায় আমাদের থাকেনা।

● সৃষ্টির সেরা মানুষ

এতোক্ষণে নিশ্চয়ই তুমি বিবেকের রায় এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি অর্থাৎ নবীগণের দেয়া সংবাদ ও সাক্ষ্যের প্রতি সাড়া দিয়েছো এবং যুক্তির দাবি মেনে নিয়েছো। যদি তাই হয়, তাহলে তুমি মহান হতে পেরেছো। মহাবিশ্বের সাথে তুমি একাত্ম হয়েছো এবং সবারচে' সেরা হয়েছো। কারণ, এই বিশ্ব এবং মহাবিশ্বের সবাই স্রষ্টার দাসত্ব করছে সৃষ্টিগতভাবে। আর তুমি আমি দাসত্ব করছি আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে। তাই আমরা মহান আল্লাহর দাসদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দাস। আমাদের মর্যাদা সবার উপরে।

এভাবেই আমরা সৃষ্টির সেরা। কারণ, আমরা বুঝেশুনে, চিন্তাভাবনা করে স্রষ্টার দাসত্বের পথ বেছে নিয়েছি। একই ভাবে আমরা অন্যসব ইলাহ ও তাগুতের (যারা প্রভু, খোদা ও উপাস্য হবার দাবি করে) আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছি। আমরা–

– আত্মার দাসত্ব করতে ও প্রবৃত্তির গোলাম হতে অস্বীকার করেছি।
– মানুষের মনগড়া শক্তি ও খোদাদের অস্বীকার করেছি।
– কল্পিত খোদাদের প্রত্যাখ্যান করেছি।
– বংশ, গোত্র ও সম্প্রদায়কে প্রভু বানাইনি।
– সমাজ, স্বজাতি ও স্বদেশকে উপাস্য বানাইনি।
– মানব রচিত আইন, বিধান, প্রথা ও ঐতিহ্যের অনুগত হইনি।
– অর্থ সম্পদ ও সামাজিক মান মর্যাদার পূজা করতে রাজি হইনি।
– সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাবানদের সহ কোনো জাগতিক খোদাদ্রোহী ক্ষমতাবানদের দাসত্ব করিনি।
– খোদাদ্রোহী রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রক্ষমতার বশ্যতা স্বীকার করিনি। এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো আনুগত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব মানিনি।

হ্যাঁ, আমরা এবারই কেবল আমাদের এবং এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা ও মালিক এক আল্লাহ দাস হতে পেরেছি। এখন মহান স্রষ্টার সৃষ্টির মাঝে আমাদের চেয়ে বড় আর কেউ নেই। আমাদের চেয়ে বেশি মর্যাদা আর কারো নেই। মহান স্রষ্টা এখন আমাদের প্রতি সবচে' বেশী সন্তুষ্ট। এখন আমরা তাঁর কঠিন শাস্তি থেকে মুক্ত হবার উপযুক্ত হয়েছি। শুধু তাই নয়, এখন আমরা তাঁর ক্ষমা, সাহায্য ও করুণা পাবার উপযুক্ত হয়েছি। উপযুক্ত হয়েছি তাঁর পুরস্কার পাবার। আমাদের জন্যেই তিনি তৈরি করে রেখেছেন পরম সুন্দর ও চির সুখের জান্নাত।

● আল্লাহকে এক মানো

তুমি যখন তোমার প্রকৃত স্রষ্টা ও মালিক আল্লাহর প্রকৃত পরিচয় জানতে পারলে, তাঁর পাঠানো নবী ও কিতাবের মাধ্যমে তাঁকে চিনতে পারলে, তখন তোমার জন্য অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় তাঁর প্রতি ঈমান আনা। তাঁকে এক ও একক মানা। কাউকে তাঁর সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ না মানা। তোমার কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় কেবল এক আল্লাহর হুকুম পালন করা, তাঁরই আনুগত্য ও দাসত্ব করা এবং বিনীত ভাবে কেবল তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ করা।

মহান স্রষ্টাকে বিশ্বাস ও স্বীকার করা এবং তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্য করার ক্ষেত্রে তোমাকে অবশ্যি চারটি অটুট প্রাচীর নির্মাণ করতে হবে। এই চার দেয়ালের ভিতর আল্লাহ ছাড়া আর কারো প্রবেশাধিকার থাকতে পারবেনা।

● পয়লা প্রাচীর হলো, আল্লাহর সত্তার এককত্বের প্রাচীর। অর্থাৎ তাঁর সত্তাকে এক ও একক জানতে ও মানতে হবে। জানতে ও মানতে হবে যে, আল্লাহ স্বয়ং সৃষ্ট, তাঁকে কেউ জন্ম দেয়নি, তিনিও কাউকে জন্ম দেননা। তাঁর কোনো স্ত্রী, সন্তান ও আত্মীয় স্বজন নেই। তাঁর সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ কেউ নেই। মহাবিশ্বের সবাই এবং সবকিছুই তাঁর সৃষ্টি এবং দাসানুদাস।

● দ্বিতীয় প্রাচীর হলো, তাঁর নিরংকুশ ক্ষমতার প্রাচীর। অর্থাৎ একথা জানতে ও মানতে হবে যে, তিনিই সকল ক্ষমতার উৎস। সকল কর্তৃত্ব কেবল তাঁর। তিনি যা ইচ্ছে তাই করতে সক্ষম। তিনি সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মালিক। মহাবিশ্বের এবং এই পৃথিবীর সবাই এবং সব কিছু তাঁর ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও ইচ্ছার কাছে সম্পূর্ণ অসহায়। তাই তাঁর সম্মুখে অন্য কারো কোনো প্রকার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আছে বলে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে হবে। কেবল তাঁরই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কাছে মাথা নত করে দিতে হবে।

● তৃতীয় প্রাচীর হলো, তাঁর অধিকার সংরক্ষণের প্রাচীর। অর্থাৎ যে মহান স্রষ্টা আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের মানুষ বানিয়েছেন, জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক দান করেছেন, অনেক যোগ্যতা-দক্ষতা-কর্মক্ষমতা দান করেছেন, উদ্ভাবনী ক্ষমতা দিয়েছেন এবং আমাদের যা যা প্রয়োজন সবই যেনো আমরা সংগ্রহ করতে পারি– এই পৃথিবীতে সে ব্যবস্থা করে রেখেছেন– সেই মহান স্রষ্টার অধিকার আমরা স্বীকার করবো। তাঁর অধিকার তাঁকে প্রদান করবো। তাঁর অধিকার আর কারো জন্যে স্বীকার করবোনা, আর কাউকেও প্রদান করবোনা।

আমাদের উপর তাঁর অধিকার হলো, আমরা কেবল তাঁরই হুকুম পালন করবো, কেবল তাঁরই আনুগত্য করবো, কেবল তাঁরই দাসত্ব করবো, কেবল তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণ করে থাকবো, কেবল তাঁরই কাছে নত ও বিনীত থাকবো, কেবল তাঁরই ইবাদত ও উপাসনা করবো, কেবল তাঁরই পূজা অর্চনা করবো, কেবল তাঁরই কাছে চাইবো, তাঁরই কাছে প্রার্থনা করবো এবং তাঁরই নিকট আরাধনা করবো। প্রয়োজনে এবং বিপদে আপদে তাঁরই কাছে ধর্ণা দেবো, তাঁরই কাছে সাহায্য চাইবো, কেবল তাঁরই মুখাপেক্ষী থাকবো।

আমাদের উপর এগুলো তাঁর অধিকার। এ অধিকার আর কাউকেও আমরা দেবোনা। তাঁর এ অধিকার আমরা সংরক্ষণ করবো।

● চতুর্থ প্রাচীর হলো, তাঁর গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলো কেবল তাঁরই জন্যে সংরক্ষণের প্রাচীর। অর্থাৎ তিনি নিজের যেসব গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন, আমরা সেগুলো আর কারো প্রতি অর্পণ করবনা, সেগুলো শুধু তাঁরই জন্যে জানবো এবং মানবো। আরবীতে তাঁর গুণাবলীকে বলা হয় 'সিফাত'। তাঁর অসংখ্য গুণ বা সিফাত রয়েছে। আল কুরআনে শতাধিক সিফাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর কয়েকটি সিফাত হলো, তিনি ঃ এক, একক, অদ্বিতীয়, অদৃশ্য, সৃষ্টির রূপকার, সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টির আকৃতিদানকারী, সর্বত্র বিরাজমান, সর্বদ্রষ্টা, নিরাকার, সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, জীবিকা দাতা, সকল ক্ষমতার উৎস, সমস্ত কর্তৃত্বের মালিক, ক্ষমতাদানকারী, অপদস্তকারী, মুখাপেক্ষাহীন, অতন্দ্র, অসীম, অপ্রতিদ্বন্দ্বী, যা ইচ্ছে তাই করেন, যাকে ইচ্ছে দান করেন, যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করেন, পরম দয়ালু, কঠিন শাস্তিদাতা, ক্ষমাশীল, দুর্জয়, দুর্দণ্ড প্রতাপশালী, সবকিছুর মালিক, গোটা সৃষ্টি সম্রাজ্যের সম্রাট, পুনরুত্থানকারী, হিসাবগ্রহণকারী, প্রতিফল দিবসের নিরংকুশ সম্রাট, প্রতিফলদাতা, উপাস্য, সংকটমোচনকারী, প্রার্থনা শ্রবণকারী, প্রার্থনা গ্রহণকারী, সাহায্যকারী, সকল প্রকার দুর্বলতা ও ক্রটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, সৃষ্টির প্রয়োজন পূরণকারী, সকল প্রকার শরীকানা ও সমকক্ষতা থেকে অনেক উর্ধ্বে অনন্য তিনি।

এগুলো এবং আরো অনেকগুলো গুণের তিনি মালিক। এমন কোনো মহান গুণ মানুষ কল্পনা করতে পারেনা, যেটার মালিক তিনি নন। তাঁর সব গুণাবলী তোমাকে জেনে নিতে হবে।

এসব গুণাবলীর তিনি একক মালিক। এ মালিকানায় কারো অনুপরিমাণ শরীকানা নেই। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কাউকেও তিনি তাঁর এসব গুণাবলীর কোনো কোনোটির অতি ক্ষুদ্র কিছু অংশ দান করেছেন। সেটা শুধুমাত্র দান। তিনি যাকে যতটুকু দান করেন সে কেবল দান সূত্রেই ততোটুকুর অধিকারী।

তাঁর এসব গুণাবলীর মালিকানা কেবল তাঁরই জন্যে সংরক্ষণ করো। কোনো মানুষ বা অন্য কারো মধ্যে এসব গুণাবলীর কোনোটির কিছু ঝিলিক দেখতে পেলে তাকে সেটার মালিক মনে করবে না। সেটাকে তার প্রতি তার স্রষ্টার দান বা অনুগ্রহ মনে করো। সে মালিক নয়, সে দান সূত্রে অধিকারী।

আমাদের ঈমান, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারনা, দৃষ্টিভংগি, চিন্তা, আচার, আচরণ, আনুগত্য, দাসত্ব, ইবাদত উপাসনাসহ জীবনের সমস্ত কর্মপ্রক্রিয়ায় এ চারটি

দিক থেকেই আমাদের স্রষ্টার এককত্বকে নিরংকুশভাবে কেবল তাঁরই জন্যে সংরক্ষণ করতে হবে।

এই প্রক্রিয়ার নামই হলো তাওহীদ বা এক আল্লাহর দাসত্ব করা। আমরা এখন থেকে নিরংকুশভাবে এক আল্লাহর দাসত্ব করবো।

● মুক্ত হও শিরক থেকে

শিরক মানে কাউকেও আল্লাহ্‌র অংশীদার সাব্যস্ত করা, কাউকেও আল্লাহর আত্মীয় স্বজন ও সমকক্ষ সাব্যস্ত করা, কারো প্রতি আল্লাহর বিশেষ গুণাবলী আরোপ করা, কাউকেও খোদায়ী ক্ষমতার অধিকারী মনে করা এবং মানুষের উপর আল্লাহ্ তা'আলার যেসব অধিকার রয়েছে, সেগুলো আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও প্রদান করা।

শিরক হলো তাওহীদের বিপরীত।

আমরা জানলাম, তাওহীদ হলো আল্লাহকে এক মানা। আল্লাহ্‌র এককত্বকে স্বীকার করে নেয়া। আমরা একথাও পড়ে এসেছি, চারটি দিক থেকে আল্লাহ্‌র এককত্বকে কেবল মাত্র আল্লাহ্‌রই জন্যে নির্দিষ্ট করতে হবে।

মূলত এরই নাম হচ্ছে তাওহীদ আর এরি বিপরীত হলো শিরক।

● শিরক চার প্রকার

উপরের আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই তোমার কাছে একথা পরিষ্কার হয়েছে যে, শিরক চার প্রকার। অর্থাৎ–

১. আল্লাহ্‌র সত্তার সাথে শিরক করা।
২. আল্লাহ্‌র গুণাবলীতে শিরক করা।
৩. আল্লাহ্‌র ক্ষমতায় শিরক করা।
৪. আল্লাহ্‌র অধিকারে শিরক করা।

আল্লাহ্‌র সত্তার সাথে শিরক করা মানে, কাউকেও আল্লাহর আত্মীয় স্বজন বা সমকক্ষ মনে করা। যেমন ইহুদীরা ওযায়েরকে আল্লাহর পুত্র মনে করে, খৃষ্টানরা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে, আবার কিছু লোক ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা সন্তান মনে করে ইত্যাদি। এভাবে আল্লাহর সত্তাকে বিভাজন করা এবং বিভাজ্য মনে করাটাই হলো আল্লাহর সত্তার সাথে শিরক করা।

আল্লাহ্‌র গুণাবলীতে শিরক করা মানে আল্লাহ তাঁর গুণাবলীর যেমনি মালিক, অন্য কাউকেও তাঁর গুণাবলীর তেমনি মালিক মনে করা। যেমন

কারো সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করা যে, সে দৃশ্য ও অদৃশ্য সম্পর্কে একই রকম অবগত, সে সব কিছুই জানে ও শুনে, সে জীবন ও মৃত্যুর মালিক, সে জীবিকাদাতা, সে সব রকমের দোষক্রুটি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত, সে অলৌকিক শক্তি বলে মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে, মঙ্গল ও অমংগল সাধনে তার হাত আছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আল্লাহ্র ক্ষমতায় শিরক করা মানে আল্লাহ্ তা'আলা সার্বভৌম, সকল ক্ষমতার উৎস এবং সর্বশক্তিমান হবার কারণে যেসব ক্ষমতা কেবল তাঁর সাথে সম্পৃক্ত, সেসব ক্ষমতা বা সেসব ক্ষমতার কোনোটি অন্য কারো আছে বলে স্বীকার করা। যেমন কাউকেও যা ইচ্ছে তাই করার ক্ষমতা আছে বলে মনে করা। কাউকেও বিপদ দূর করার ক্ষমতা আছে বলে মনে করা। কাউকেও সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক মনে করা। জনগণকে ক্ষমতার উৎস মনে করা। আল্লাহ ছাড়া কাউকেও আইন ও বিধান দাতা মনে করা। আল্লাহ ছাড়া আর কারো আইন স্বীকার করে নেয়া। আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও কোনো কিছু হারাম করার কিংবা কোনো কিছু হালাল করার অধিকারী মনে করা।

আল্লাহর অধিকারে শিরক করা মানে, আল্লাহ মানুষের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, মালিক, প্রতিপালক, পরিচালক, প্রভু, মনিব, প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহকারী, প্রতিফলদাতা, হিসাব গ্রহণকারী, ক্ষমাকারী, কঠোর শাস্তিদাতা, পুরস্কার প্রদানকারী, সাহায্যকারী, রক্ষাকারী, মোচনকারী এবং সর্ব প্রকার ভালো-মন্দের অধিকর্তা হিসেবে মানুষের উপর তাঁর যেসব বিশেষ অধিকার রয়েছে, সেসব অধিকার বা তার কোনো একটি অধিকার তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকেও প্রদান করা।

তাঁর অধিকারগুলোর মধ্যে রয়েছে, মানুষ কেবল তাঁরই দাসত্ব করবে, কেবল তাঁরই আনুগত্য করবে, কেবল তাঁরই হুকুম মেনে চলবে, কেবল তাঁরই বিধান মতো জীবন যাপন করবে, কেবল তাঁরই কাছে মাথা নত করবে, কেবল তাঁকেই সিজদা করবে, কেবল তাঁরই ইবাদত করবে, কেবল তাঁরই উপাসনা করবে, কেবল তাঁরই কাছে হাত জোড় করবে, কেবল তাঁরই কাছে প্রার্থনা করবে, সব ধরনের নিয়ামতের জন্যে কেবল তাঁরই প্রশংসা করবে, সকল অনুগ্রহের জন্যে কেবল তাঁরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে, কেবল তাঁরই নামে নযরানা ও কুরবানী পেশ করবে, কেবল তাঁরই জন্যে বিনয় ও ভক্তি প্রকাশ করবে, বিপদে আপদে কেবল তাঁরই সাহায্য চাইবে, সংকট মোচন ও

মুসীবত দূর করার জন্যে কেবল তাঁকেই ডাকবে, কেবল তাঁরই নামে মানত করবে, কেবল তাঁরই জন্যে সম্মান প্রদর্শন করবে।

তাঁর অধিকারের মধ্যে রয়েছে, মানুষ তাঁকেই সর্বাধিক ভালো বাসবে, তাঁর চাইতে অধিক কাউকেও ভালো বাসবে না। জীবনের সমস্ত কাজ তাঁর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসার জন্যে করবে। গোপনে ও প্রকাশ্যে তাঁকেই ভয় করবে। তাঁর অসন্তুষ্টির পথে কাউকেও সন্তুষ্ট করবেনা। তাঁরই জন্যে কাউকেও ভালোবাসবে, তাঁরই জন্যে কাউকেও পরিত্যাগ করবে। এভাবে জীবনের সমস্ত কাজ তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্যে করবে, যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট সে কাজ করবে, যে কাজে তিনি অসন্তুষ্ট সে কাজ পরিত্যাগ করবে।

মানুষের উপর এগুলো আল্লাহর অধিকার। এসব অধিকার বা এর কোনো একটি অধিকার আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেও প্রদান করা মানেই তাকে ইলাহ বা উপাস্য মেনে নেয়া। আর এটাই হলো আল্লাহর অধিকারে শিরক করা।

এতোক্ষণ আমরা চার প্রকার শিরকের কথা আলোচনা করলাম। সেগুলো হলো– আল্লাহর সত্তার সাথে শিরক করা, আল্লাহর গুণাবলীতে শিরক করা, আল্লাহর ক্ষমতায় শিরক করা এবং আল্লাহর অধিকারে শিরক করা।

● শিরক মহাপাপ

শিরক, সেটা যে প্রকারেরই হোক, তা মহাপাপ। শিরকের চেয়ে বড় কোনো অপরাধ নেই। এর চেয়ে বড় কোনো গুনাহ নেই। এর চেয়ে বড় কোন পাপ নেই।

যারা শিরক করে, তাদের বলা হয় মুশরিক।

শিরক যারা করে, তারা আল্লাহকে অবিশ্বাস করেনা। বরং তারা আল্লাহকে স্বীকার করে এবং সাথে সাথে আল্লাহর সত্তায়, কিংবা তাঁর গুণাবলীতে, অথবা তাঁর ক্ষমতায়, নতুবা তাঁর অধিকারে অংশীদার বানিয়ে নেয়।

শিরক বিশ্বাসগত ভাবেও হয়, আবার কেবল কর্মগতভাবেও হয়।

বিশ্বাসগত শিরক হলো, যেমন কেউ বিশ্বাস করলো যে আল্লাহর পুত্র আছে, কিংবা অমুক ব্যক্তি গায়েব (অদৃশ্য) জানে, কিংবা অমুক মৃত ব্যক্তি আমার প্রার্থনা শ্রবণ করতে এবং বিপদ দূর করতে পারে, অথবা অমুক ব্যক্তি যা ইচ্ছা তা করার ক্ষমতা, রাখে, কিংবা অমুক ব্যক্তিকে খুশি না করে আল্লাহকে খুশি করা যাবেনা ইত্যাদি।

আর শুধু কর্মগত শিরক হলো, যেমন আল্লাহর রসূল সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ে, সে শিরক করে।'

শিরক যেরকমেরই হোক, তা মহাপাপ। বিশ্বজগতের মালিক মহান আল্লাহ আল কুরআনে শিরক ও মুশরিকদের সম্পর্কে বলেছেন :

১. শিরক আল্লাহর প্রতি সবচেয়ে বড় যুল্‌ম (অবিচার)। (সূরা ৩১ : ১৩)
২. "যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে, সে মিথ্যা কথা রচনা করে, সেই সাথে করে মহাপাপ।" (সূরা ৪ আন নিসা : ৪৮)
৩. 'মুশরিকরা (বিশ্বাসের দিক দিয়েই) অপবিত্র।' (সূরা ৯ : ২৮)
৪. 'তুমি কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।' (সূরা ৬ আল আনআম : ১৪; সূরা ১০ ইউনুস : ১০৫)
৫. নবী এবং ঈমানদারদের উচিত নয় মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, এমন কি তারা নিকট আত্মীয় হলেও। কারণ, তারা যে জাহান্নামী একথা তো পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে। (সূরা ৯ আত তাওবা : ১১৩)
৬. "আল্লাহ কিছুতেই শিরকের পাপ মাফ করবেন না। এ ছাড়া অন্য যে পাপই হোক, সেটা তিনি যাকে ইচ্ছে মাফ করে দেন।" (সূরা ৪ : ৪৮)
৭. "শিরক যে-ই করবে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন।" (সূরা ৫ আল মায়িদা :৭২)

● ঈমান ও শিরক

শিরকের পরিণতি যে কতো ভয়াবহ, মহান আল্লাহর এসব ঘোষণা থেকেই সেকথা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় হলো, শিরক কিন্তু নাস্তিকরা করেনা, কাফিররা করেনা; শিরক করে ঈমানদাররা। শিরক করে তারা, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে।

তুমি তো আগেই জেনেছো, মুশরিকরা আল্লাহকে আল্লাহ বলে মানে এবং বিশ্বাস করে, তবে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন না করে তারা অজ্ঞতাবশত অন্ধ বিশ্বাসের ভিত্তিতে আল্লাহর সাথে অন্যদের শরীক করে বা অংশীদার বানায়। তাদের কেউ আল্লাহর সত্তার সাথে অংশীদার বানায়। কেউ আল্লাহর গুণাবলীতে অংশীদার বানায়। কেউবা আল্লাহর ক্ষমতার অংশীদার বানায়। আবার কেউ আল্লাহর অধিকারে শরীকদার বানিয়ে নেয়।

এভাবে একদল লোক ঈমানের সাথে শিরক মিশ্রিত করে। অমুসলিমদের মধ্যে যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে তারা তো শিরক করেই; কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, বর্তমান মুসলিম সমাজেও শিরক ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলিম সমাজে আল্লাহর সত্তার সাথে শিরক করা না হলেও আল্লাহর গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকারে ব্যাপকভাবে শিরক করা হচ্ছে।

তাই নিজেদেরকে মুমিন বা মুসলিম বলে দাবি করলেই চলবেনা, বরং সেই সাথে সকল প্রকার শিরক থেকে নিজেদের পুরোপুরি মুক্ত করতে হবে। তবেই হওয়া যাবে প্রকৃত মুমিন, প্রকৃত মুসলিম। আল্লাহ তা'আলা দেখতে পাচ্ছেন অধিকাংশ ঈমানদারই শিরক করে। তিনি বলেন :

"মহাবিশ্ব এবং এই পৃথিবীতে (আল্লাহর একত্বের) কতো সীমা সংখ্যাহীন নির্দশন রয়েছে। দিনরাত তারা এসব নিদর্শনের উপর দিয়ে হেঁটে চলে, কিন্তু সকল নিদর্শনই তারা উপেক্ষা করে চলে (কোনোটি সম্পর্কেই তারা ভেবে দেখেনা)। তাদের বেশীর ভাগ লোকই আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে, কিন্তু সেইসাথে তারা আল্লাহর সাথে শিরক করে।" (সূরা ১২ ইউসুফ : ১০৫-৬)

● চাই নির্ভেজাল ঈমান

হাঁ, আল্লাহ সত্যি বলেছেন, ঈমান থাকা সত্ত্বেও অনেক লোকের ঈমানেই ভেজাল আছে। আর সেই ভেজালটা হলো শিরক। শিরক যুক্ত ঈমানের কোনো মূল্য আল্লাহর কাছে নেই। আল্লাহ কিছুতেই শিরকের অপরাধ ক্ষমা করবেন না এবং যারা শিরক করে, তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। জান্নাত তাদের জন্য হারাম।

এবার তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো, ঈমান হতে হবে সম্পূর্ণ নির্ভেজাল। কারো বিশ্বাসে, ধ্যান ধারণায় ও মন মস্তিষ্কে যদি শিরকের বিন্দুমাত্র প্রভাবও থাকে, তবে প্রথমেই তাকে সেগুলো ছুঁড়ে ফেলতে হবে। নিজের বিশ্বাস, ধ্যান ধারনা ও মন মস্তিষ্ককে শিরক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে ধুইয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ঝকঝকে ত্বকত্বকে করে নিতে হবে। তারপর সেই পরিচ্ছন্ন মস্তিষ্কে এক আল্লাহর প্রতি শুদ্ধ স্বচ্ছ বিশ্বাসকে মজবুত ও পরিপাটি করে বসিয়ে নিতে হবে।

এভাবেই তুমি হতে পারো নির্ভেজাল ঈমানের অধিকারী প্রকৃত মুমিন। আল্লাহ এভাবেই তাঁর প্রতি ঈমান আনতে বলেছেন। তিনি বলেছেন :

"দীনের (অর্থাৎ এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার ও তাঁর নির্দেশিত পথে চলার) ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই। ভুল মত ও পথ থেকে সঠিক মত ও পথকে আলাদা করে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এখন যে কেউ তাগুতকে (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়াও অন্য যাদেরকে খোদা মানা হয়, তাদেরকে) অস্বীকার ও অমান্য করে কেবলমাত্র আল্লাহরই প্রতি ঈমান আনে, সে এমন এক অবলম্বন আঁকড়ে ধরে যা কখনো ছিড়ে যায়না।" (সূরা ২ : ২৫৬)

এ আয়াত থেকে আমরা কয়েকটি কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম। সেকথাগুলো হলো :

- আল্লাহর সঠিক পরিচয় না জেনে ঈমান আনার এবং ইসলামের পথে আসার কোনো সুযোগ নেই। এ পথে জোর করেও কাউকে আনার সুযোগ নেই।
- আল কুরআনে আল্লাহর সঠিক পরিচয় কি এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথ কোনটি? অন্যদিকে শিরক ও তাগুতের পরিচয় কি? স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে।
- এখন যে কোনো ব্যক্তি নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে, সেকি এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর দাসত্ব করবে? নাকি আল্লাহর সাথে অন্যদের অংশীদার বানাবে এবং শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত থাকবে?
- ঈমান আনার সঠিক পদ্ধতি হলো, তাগুত অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদের খোদায়ীত্ব মানা হয়, প্রথমে তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার ও অমান্য করতে হবে। অতপর নিজের মন মস্তিষ্কে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে মজবুত করে বসাতে হবে। তাঁর সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকারে তাঁকে এক এবং কেবলমাত্র এক ও একক জানতে ও মানতে হবে।
- এটাই আল্লাহর প্রতি ঈমানের মজবুত রশি। এ রশি কখনো ছিঁড়বেনা। এ রশি ধরেই পৌঁছা যাবে চির সুখের জান্নাতে। আর যারা তাগুতদের খোদা বানিয়ে নেয়, পরকালে তাদের এই সম্পর্কের রশি ছিঁড়ে যাবে এবং তারা উপুড় হয়ে গিয়ে পড়বে জাহান্নামে।

● তাওহীদের ঘোষণা দাও

এভাবে খোদায়ীত্ব ও মানুষের দাসত্ব লাভের দাবিদার সকলকে অস্বীকার ও অমান্য করে কেবলমাত্র এক আল্লাহকে এবং সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর এককত্বকে মেনে নেয়ার নামই হলো তাওহীদ। আর এভাবে তাওহীদের ঘোষণা দিয়েই ঈমান আনতে হয়। সেই ঘোষণাটি হলো :

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।'

এর অর্থ হলো : 'কেনো ইলাহ নাই এক আল্লাহ ছাড়া।' এই ঘোষণা দেয়া ছাড়া কেউ ঈমান ও ইসলামে প্রবেশ করতে পারেনা। নবীর সময় যারাই ঈমান আনতে চাইতো, এই ঘোষণা দিয়েই ঈমান আনতে হতো।

সকলেই এভাবে ঘোষণা দিতো :

'আশহাদু আন্‌লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।'

অর্থ : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কোনো ইলাহ নাই আল্লাহ ছাড়া।' আজও পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মসজিদ থেকে দৈনিক পাঁচবার এই ঘোষণা দেয়া হয়।

এই সাক্ষ্য বা এই ঘোষণা দিয়েই ঈমান আনতে হয়। কিন্তু এই ঘোষণাটির মর্ম কি? কী এর তাৎপর্য? হ্যাঁ, এ ঘোষণাটির মর্ম তোমাকে বুঝতে হবে। তবে প্রথমেই বুঝতে হবে 'ইলাহ' মানে কি?

– ইলাহ মানে উপাস্য। অর্থাৎ যার ইবাদত, দাসত্ব ও উপাসনা করা হয়।
– ইলাহ মানে স্রষ্টা ও প্রতিপালক।
– ইলাহ মানে সার্বভৌম সত্তা, যার বিধান ও নির্দেশ সর্বত্র এবং সকলের উপর বিরাজমান ও কার্যকর।
– ইলাহ মানে সেই সত্তা যার আইন ও বিধান মানা হয়।
– ইলাহ মানে রক্ষাকর্তা, সাহায্যকারী, পৃষ্ঠপোষক, সংকট মোচনকারী, প্রয়োজন পূরণকারী, ফরিয়াদ শ্রবণকারী, প্রার্থনা গ্রহণকারী।

এবার তুমি ইলাহ শব্দের অর্থ বুঝলে। এখন কোনো ইলাহ নাই আল্লাহ ছাড়া' - একথার অর্থ বুঝাও সহজ হয়ে গেলো। যখন কোনো ব্যক্তি ঈমান আনার সময় বলে : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, কোনো ইলাহ নাই আল্লাহ ছাড়া'– তখন এ ঘোষণার অর্থ ও মর্ম এই দাঁড়ায় যে :

আমি আল্লাহ ছাড়া আর সমস্ত ইলাহকে অস্বীকার করছি। আমি আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করবো না, আর কারো পূজা উপাসনা করবোনা, আর কারো ইবাদত করবোনা, আর কারো আনুগত্য করবোনা, আর কারো কাছে মাথা নত করবোনা, আর কারো আইন মানবোনা, আর কারো তৈরি বিধান মতো চলবোনা, আর কারো অধীনতা স্বীকার করবোনা, আর কারো সার্বভৌম ক্ষমতা ও অধিকার স্বীকার করবোনা, আর কারো শাসন মানবোনা, আর কারো কাছে প্রার্থনা করবোনা, আর কাউকেও প্রয়োজন পূরণকারী মানবোনা, আর কাউকেও

ভয় করবোনা, আর কাউকেও রক্ষাকর্তা মানবোনা, আর কারো কাছে কিছু আশা করবোনা, আর কারো মুখাপেক্ষী আমি হবোনা, আর কারো উপর ভরসা করবোনা, আর কাউকেও জীবন-মৃত্যুর মালিক মনে করবোনা।

এসব কিছুর মালিকানা, অধিকার ও ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহর। এসব কিছু কেবল মাত্র আল্লাহর বলে মানবো এবং করবো। এগুলোর মালিকানা, অধিকার ও ক্ষমতা অন্য সকলের জন্যে অস্বীকার ও অমান্য করবো।

হ্যাঁ, এরি নাম হলো তাওহীদের ঘোষণা। এ ঘোষণা দিয়েই ঈমান আনতে হয়। সারাজীবন এ ঘোষণার উপর অটল অবিচল হয়ে থাকতে হয়। এ ঘোষণার ভিত্তিতেই জীবন পরিচালিত করতে হয়। জীবনের সমস্ত কাজ এ ঘোষণা অনুসারেই সম্পাদন করতে হয়। এমনটি যে করবে, সে ব্যক্তিই মুমিন, সেই প্রকৃত মুসলিম।

এখন তুমি তোমার নিজের অবস্থা ভেবে দেখো।

● এসো ঘোষণা দিয়ে ঈমান আনি

আমরা বুঝলাম, জন্মগতভাবে কিংবা প্রচলিত নিয়মে মুমিন হওয়া যায়না। ঈমান আনতে হয় আল্লাহর সঠিক পরিচয় জেনে নিয়ে। মন মস্তিষ্ক থেকে অন্য সকল ইলাহ ও তাগুতকে দূরে নিক্ষেপ করে, তাদের সম্পূর্ণ অস্বীকার ও অমান্য করে এক আল্লাহর প্রতি নির্ভেজাল ঈমান আনতে হয়।

আমাদের প্রিয় নবীর পূর্ব পুরুষরা সবাই আল্লাহকে বিশ্বাস করতো, স্বীকার করতো। আবু বকরের পিতাও আল্লাহকে বিশ্বাস করতো। উমরের পিতাও আল্লাহকে বিশ্বাস করতো। উসমানের পিতাও আল্লাহকে বিশ্বাস করতো। আলীর পিতাও আল্লাহকে বিশ্বাস করতো। আবু জাহল এবং আবু লাহাবও আল্লাহকে বিশ্বাস করতো। আবু লাহাবের স্ত্রী এবং হেন্দাও আল্লাহকে বিশ্বাস করতো। উতবা, শাইবাও আল্লাহকে বিশ্বাস করতো। কিন্তু এরা মুশরিক ছিলো, তারা আল্লাহর সাথে শিরক করতো। প্রিয় নবী এদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিলে এরা নবীর বিরোধিতা করেছিল। তারা নবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পর্যন্ত করেছে। নবীও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন।

নবী এবং সাহাবীগণের আত্মীয় স্বজন হলেও আল্লাহ এদের ক্ষমা করবেন না। এরা জাহান্নামে যাবে। জান্নাত এদের জন্য হারাম। কারণ তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করেও শিরক করতো।

এরা আল্লাহকে বিশ্বাস করতো। কিন্তু সাহাবীদের পিতা-মাতা, ভাইবোন এবং আত্মীয় স্বজন হওয়া সত্ত্বেও সাহাবীগণ এদের অনুসরণ করেননি। বরং তারা নবীকে অনুসরণ করেছেন। তাঁরা আল্লাহর সঠিক পরিচয় জেনেছেন। তাই তারা আল্লাহ ছাড়া সকল ইলাহকে অস্বীকার ও অমান্য করে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছেন।

আমাকে এবং তোমাকে সাহাবাগণের মতো হতে হবে। আমরা তাঁদের মতো আল্লাহ ছাড়া সকলের খোদায়ীত্ব এবং ইলাহ হওয়াকে অস্বীকার করবো। কেবলমাত্র আল্লাহকে ইলাহ বলে মানবো, ঘোষণা করবো এবং শুধুমাত্র তাঁরই দাসত্ব করবো।

ঈমানের সাক্ষ্য বা ঘোষণার তিনটি স্তর আছে। সে স্তরগুলো হলো:

১. মানসিক প্রশান্তির সাথে মেনে নেয়া।

২. মৌখিক ঘোষণা দান।

৩. বাস্তব জীবনে প্রতিফলন।

অর্থাৎ তোমাকে আল্লাহ তা'আলার সঠিক পরিচয় ও এককত্ব সম্পর্কে জানতে হবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলের ইলাহ হওয়া ও দাসত্ব লাভের দাবিকে মিথ্যা-বাতিল বলে জানতে হবে। অতপর অন্য সকলকে প্রত্যাখ্যান করে কেবলমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহর এককত্বের বিষয়ে মনকে নিশ্চিন্ত করো। এ বিষয়ে বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে মন মস্তিষ্ককে প্রশান্ত করো। অতপর মনের প্রশান্তির সাথে আল্লাহকে ইলাহ বলে মেনে নাও এবং একমাত্র ইলাহ বলে মেনে নাও। তারপর অন্যদের কাছেও আল্লাহকে জানার, মানার এবং অন্য সকল ইলাহ্কে পরিত্যাগ করে তাঁকেই একমাত্র ইলাহ হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছো বলে সাক্ষ্য দাও। অতপর নিজের বাস্তব জীবনে শুধুমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করে যাও। কেবল তাঁরই বিধানমতো জীবন যাপন করো, শুধুমাত্র তাঁরই আইন মেনে চলো। কেবল তাঁরই হুকুম মেনে চলো। কেবল তাঁরই ইচ্ছে মতো তাঁরই সন্তুষ্টির পথে জীবন যাপন করো।

এটাই হলো ঈমানের ঘোষণা ও সাক্ষ্য দান। আল্লাহর সঠিক পরিচয় জানার পর এসো, আমরা নতুন করে তাঁর প্রতি ঈমান আনার ঘোষণা প্রদান করি।

● ঈমানের বিস্তৃত রূপ

এবার তুমি প্রকৃত মুমিন হলে। তবে আরো কয়েকটি বিষয়ের প্রতি তোমাকে ঈমান আনতে হবে। সেগুলোর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ স্বয়ং

আল্লাহ তা'আলাই দিয়েছেন। সেগুলো অদৃশ্য বিষয়। সেগুলোর প্রতি ঈমান না আনলে ঈমান পূর্ণ হয়না। সেগুলোর প্রতি ঈমান আনা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনারই অনিবার্য দাবি। সেগুলো হলো :

১. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান।
২. রিসালাতের প্রতি ঈমান।
৩. আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান।
৪. আখিরাতের প্রতি ঈমান।

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার সাথে সাথে এই চারটি বিষয়ের প্রতিও ঈমান আনার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহই দিয়েছেন। তিনি বলেন :

"প্রকৃত সত্য ও ন্যায়ের পথে আছে সেই সব লোক, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, আখিরাতের প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, কিতাবের প্রতি এবং নবীদের প্রতি আর অর্থ সম্পদ দান করেছে.....।" (সূরা ২ : ১৭৭)

এছাড়া জগতে এবং মানব জীবনে ভালোমন্দ যা কিছুই ঘটে, সবই আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মে সংঘটিত হয় বলে বিশ্বাস করাও ঈমানের একটি অংগ। এটাকে বলা হয় 'ঈমান বিল কদর' বা তকদীরের প্রতি ঈমান। অর্থাৎ একথা বিশ্বাস করা যে, সব কিছুই আল্লাহর ইচ্ছায় বা আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মে, কিংবা আল্লাহর ক্ষমতার অধীনে সংঘটিত হচ্ছে।

● ফেরেশতাদের প্রতি ঈমানের অর্থ

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান রাখার অর্থ হলো, এই বিশ্বাস করা যে, ফেরেশতা আছে। তারা আল্লাহর সৃষ্টি। তারা আল্লাহর দাস। তারা নারীও নয়, পুরুষও নয়। তাদের নিজস্ব কোনো ইচ্ছা বা কামনা বাসনা নেই। তারা আল্লাহর সার্বভৌম সাম্রাজ্যে আল্লাহর দাস-কর্মচারী। বিশ্বসম্রাজ্য পরিচালনায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন। আল্লাহর নির্দেশ পালন ছাড়া অন্যকিছু করতে তারা অক্ষম। তারা কখনো আল্লাহর হুকুম অমান্য করেনা। আল্লাহ যা হুকুম করেন, তারা কেবল তাই করে।

● রিসালাতের প্রতি ঈমানের মানে

রিসালাত মানে মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী বা বার্তা পাঠাবার প্রণালী, রীতি বা নিয়ম (System)। রিসালাত ও নবুয়্যত একই সিস্টেমের দুইটি নাম বা পরিভাষা। এই দু'টির অর্থ ও তাৎপর্য মূলত একই। যার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তার বাণী বা বার্তা পাঠান, তাকে নবী বা রসূল বলা হয়।

'নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের সাক্ষ্য' শিরোনামে একটু আগেই আমরা নবুয়্যত ও রিসালাত সম্পর্কে আলোচনা করে এসেছি।

মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্য থেকেই কিছু লোককে নবী বা রসূল নিযুক্ত করেছেন। প্রতিটি জনপদেই আল্লাহ তা'আলা নবী বা রসূল নিযুক্ত করেছেন। নবীগণ মানুষ ছিলেন।

নবীগণ একাধারে আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক তথা সকল ব্যাপারে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁরা সকল ব্যাপারে সর্বোত্তম আদর্শ। মুমিন ব্যক্তিকে সব নবীর প্রতিই ঈমান রাখতে হবে।

মুহাম্মদ সা. আল্লাহর শেষ নবী। তাঁর পরে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে আর কোনো নবী নিযুক্ত করবেন না। তিনি সারা বিশ্বের সব মানুষের নবী।

এক আল্লাহর দাসত্ব করার জন্যে, তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার জন্যে এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার জন্যে কেবলমাত্র মুহাম্মদ সা. কেই অনুসরণ করতে হবে। কেবল তাঁর দেখানো পথেই চলতে হবে। তিনি আল্লাহর যে বাণী পৌঁছে দিয়ে গেছেন, সে অনুযায়ী সব মানুষের জীবন যাপন করা উচিত। তাঁকে অস্বীকার ও অমান্য করে কেউ মুমিন হতে পারবেনা। তার আগমনের পর অনুসরণ করতে হবে কেবল তাঁকে, আর ঈমান রাখতে হবে সকল নবীর প্রতি। এই হলো নবুয়্যত ও রিসালাতের প্রতি ঈমানের মর্মকথা।

● কিতাবের প্রতি ঈমানের তাৎপর্য

নবীগণের উপর আল্লাহর যে বাণী (অহী) অবতীর্ণ হয়েছে, সেসব বাণীর সংকলিত রূপই হলো আসমানি কিতাব বা আল্লাহর কিতাব। পূর্ববর্তী নবীগণের উপর অবতীর্ণ কিতাবসমূহ হারিয়ে গেছে অথবা একেবারে বিকৃত হয়ে গেছে।

এখন একমাত্র আল কুরআনই নির্ভুল খোদায়ী কিতাব হিসাবে মানুষের কাছে বর্তমান আছে। অবতীর্ণের সময় থেকেই এ গ্রন্থকে সুরক্ষিত করা হয়েছে। আর স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই এ গ্রন্থকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ হলো, আল্লাহর অবতীর্ণ সব কিতাবের প্রতিই ঈমান রাখতে হবে। তবে অনুসরণ করতে হবে এবং মেনে চলতে হবে কেবলমাত্র আল কুরআনকে।

আল কুরআন পৃথিবীর মানুষের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। এ গ্রন্থ আরবি ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। পৃথিবীর সব ভাষার লোকদেরই এ গ্রন্থ বুঝা এবং মানা জীবনের সবচেয়ে বড় কর্তব্য।

আল কুরআন কেবল মুসলমানদের জন্য অবতীর্ণ হয়নি। আল কুরআনের উপর পৃথিবীর সব মানুষের অধিকার সমান। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষেরই কুরআন পড়া এবং কুরআনের বক্তব্য সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ও বিবেচনা করা উচিত। এই হলো কিতাবের প্রতি ঈমান আনার অর্থ।

● আখিরাতের প্রতি ঈমান আনার মর্ম

আখিরাত হলো মৃত্যুর পরবর্তী জীবন। মানুষের যখন মৃত্যু হয় তখন আত্মার মৃত্যু হয়না, মৃত্যু হয় তার দেহের। দেহ থেকে আত্মা (life) স্থানান্তরিত (Transfer) করার নামই মৃত্যু। স্থানান্তরের আরবি প্রতিশব্দ হলো ইন্তেকাল। তাই মৃত্যুকে 'ইন্তেকাল'ও বলা হয়।

দেহ থেকে বের করার পর মানুষের আত্মাকে যেখানে নিয়ে রাখা হয়, সে স্থানকে বলা হয় 'আলমে বরযখ' বা অন্তরালের জগত।

অতপর একদিন এ জগত ধ্বংস হয়ে যাবে। পৃথিবী এবং পৃথিবীর সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। এটাকে বলা হয় 'কিয়ামত'।

ধ্বংসের পর পৃথিবী থেকে মরে যাওয়া সব মানুষকে পুনরায় দেহ দিয়ে জীবিত করা হবে। এটা করা আল্লাহর জন্যে খুবই সহজ। যিনি মানুষকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তাঁর জন্যে সেই মানুষগুলোকে পুনরায় সৃষ্টি করা কঠিন হবে কেন?

ধ্বংসের পর এই পৃথিবীটাকেও পুনরায় গড়া হবে। তখন এই গ্রহটাকে আরো বহু বহু গুণ প্রশস্ত করে বানানো হবে এবং একেবারেই সমতল করা হবে। তখন এই বিশাল পৃথিবী হবে একটা সমতল মাঠের মতো। পুনরায় জীবিত করার পর প্রথমবার পৃথিবীতে আগত সব মানুষকে এই সমতল মাঠে সমবেত করা হবে। এর নাম 'হাশর বা সম্মেলন'।

এই হাশর বা সম্মেলনে আল্লাহ তা'আলা সব মানুষের বিচার করবেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীর জীবনে মানুষ আল্লাহর নির্দেশিত বিধান মতো জীবন যাপন করেছে কিনা? আল্লাহর নবী ও কিতাবের নির্দেশ মতো চলেছে কিনা? একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করেছে কিনা? কেউ আল্লাহর অধিকার নষ্ট করেছে

কিনা? আল্লাহর হুকুম অমান্য করেছে কিনা? কোনো মানুষ অপর কারো অধিকার হরণ করেছে কিনা?

দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে আল্লাহ্ পাক এগুলোর বিচার করবেন। তিনি পরিপূর্ণ ন্যায় বিচার করবেন। কারো প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করবেন না। বিচারে যারা পাশ করবে, তিনি তাদের চিরসুখের জান্নাতে থাকতে দেবেন। বিচারে যারা অকৃতকার্য হবে, তাদের থাকতে দেবেন চিরদুখের জাহান্নামে।

এই হলো আখিরাত। এর প্রতি ঈমান আনতে হবে।

● আখিরাতের প্রয়োজন কেন?

আখিরাতের জীবন অকাট্য সত্য। এ বিষয়টি আল্লাহ্ পাক আল কুরআনে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন।

মানুষের যুক্তি এবং বিবেক বুদ্ধিও বলে আখিরাত অবশ্যি থাকতে হবে। একটু ভেবে দেখো। এই পৃথিবীতে, আমাদের সমাজে, আমাদের আশে পাশে কিছু মানুষ অহরহ অন্য মানুষদের অধিকার নষ্ট করছে। একজন আরেক জনের উপর যুল্‌ম, অত্যাচার, অবিচার করছে। একজন আরেক জনকে হত্যা করছে। এমনও লোক আছে যে বহু মানুষকে হত্যা করেছে।

পৃথিবীর জীবনে অর্থ ও ক্ষমতার দাপটে যারা অন্যদের উপর যুলম অত্যাচার করে, এই পৃথিবীতে তাদের থেকে প্রতিশোধ নেবার কোনো সুযোগ নেই। এমনকি পৃথিবীতে অপরাধীর বিচার হলেও তাতে যালিমকে পূর্ণ শাস্তি দেয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া মযলুমকেও তার পূর্ণ অধিকার ফেরত দেয়া সম্ভব নয়।

যেমন মনে করো, একজন আরেক জনের ইজ্জত ও সম্মান নষ্ট করেছে। দুনিয়ার বিচারে এই অপরাধীকে যে শাস্তিই দেয়া হোক তা পূর্ণ শাস্তি হবেনা। ইজ্জত হারা ব্যক্তিকে যে ক্ষতিপূরণই দেয়া হোক, সে ইজ্জত ফিরে পাবেনা। এই পৃথিবীতে সে সুযোগ নেই। তাই অপরাধীর পূর্ণ শাস্তি হওয়া আর অধিকার হারা ব্যক্তির পূর্ণ অধিকার ফিরে পাবার জন্যে আখিরাতের জীবন প্রয়োজন।

এক ব্যক্তি যদি বহু লোকের অধিকার নষ্ট করে, বহু লোকের ইজ্জত নষ্ট করে, তবে এই পৃথিবীতে তার উপর অতোটা শাস্তি প্রয়োগ করার সুযোগ নেই। আর মযলুমদেরও পূর্ণ অধিকার ফেরত পাবার সুযোগ এখানে নেই।

এক ব্যক্তি এ পৃথিবীতে বহু লোককে হত্যা করলো। এই অপরাধে যদি তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়, তবে সেটা তার পূর্ণ শাস্তি হয়না। অনেকগুলো

জীবনের বিনিময় একটি জীবন হতে পারেনা। যারা শত্রুতা বশত মানুষ হত্যা করে, যারা অন্যায়ভাবে মানুষের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে অসংখ্য মানুষকে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দেয়, এই পৃথিবীর জীবনে কি তাদের উপযুক্ত শাস্তি পাবার সুযোগ আছে। অন্যদিকে নিহতরা তো তাদের জীবন ফিরে পেলনা। এই পৃথিবীতে পূর্ণ শাস্তি প্রয়োগ এবং পূর্ণ অধিকার ফিরে পাবার সুযোগ নেই।

অন্যদিকে পৃথিবীতে এমন বহু মানুষ আছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে মানুষের কল্যাণ করে। এক ব্যক্তির প্রচেষ্টায় দশজন, বিশজন, পঞ্চাশ জন কিংবা আরো বেশি বা কম লোক আল্লাহর পথে, ঈমানের পথে, সত্যের পথে এলো। তা ছাড়া সে আরো অসংখ্য ভালো কাজ করলো। এখন তার এসব প্রচেষ্টা ও ভালো কাজের পুরস্কার যদি তাকে এই পৃথিবীতে দেয়া হয়, তবে তার ষাট সত্তর বছর বয়েসের মধ্যে এগুলো ভোগ করার কোনো সুযোগ তার নেই। তার জন্যে প্রয়োজন একটি মৃত্যুহীন জীবন।

নবীগণের প্রচেষ্টায় অসংখ্য মানুষ সত্য পথে এসেছে। পৃথিবীর জীবনে একাজের কোনো ফল ভোগ করাতো দূরের কথা, বরং এর জন্য তাঁরা ভোগ করেছেন দুঃখ কষ্ট। তাই এর প্রতিফল ভোগ করার জন্যে অবশ্যি মৃত্যুহীন জীবন প্রয়োজন। সেটাই আখিরাতের জীবন।

খাদীজা, আবু বকর, উমর, যায়েদ, জাফর, হামজা, সুমাইয়া আম্মার, আবদুল্লাহ, সা'আদ, আয়েশা, ইবনে মাসউদ, হোসাইন (রাদিয়াল্লহু আনহুম) এবং আরো যারা চরম দুঃখ কষ্ট ভোগ করে মানুষকে সত্য পথে আনার জন্যে কাজ করে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, এই বিরাট প্রচেষ্টা ও ত্যাগের পুরস্কার ও প্রতিফল কি তাদের পাওয়া ও ভোগ করা উচিত নয়? হ্যাঁ, তার জন্য অবশ্যি প্রয়োজন মৃত্যুহীন জীবন। আর সেটাই আখিরাতের জীবন।

আমাদের বিবেক বুদ্ধির স্বাভাবিক রায় হলো, পরকালের অনন্ত জীবন অবশ্য অবশ্যি প্রয়োজন।

এই প্রয়োজনের আরেকটি দিক আছে। সেটা হলো, পরকালে যদি বিচার না হতো, অপরাধীদের ধরা পড়ার ব্যবস্থা না থাকতো, তাদের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা না থাকতো এবং আল্লাহ যদি তাঁর এসব ব্যবস্থার কথা না জানাতেন, তবে এই পৃথিবীটা আর মানুষের বসবাসের উপযুক্ত থাকতোনা। সব মানুষ অপরাধে জড়িয়ে পড়তো। যুল্‌ম অত্যাচারে পৃথিবী ভরে যেতো। মানুষ মানুষের ইজ্জত, সম্পদ ও অধিকার হরণের জন্যে বেপরোয়া হয়ে উঠতো। চুরি

ডাকাতি, হত্যা, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও দুষ্কর্মে মানুষ দুর্জয় হয়ে উঠতো। কারণ, তখন সে ভাবতো, পৃথিবীর জীবনে ধরা না পড়লেই তো হলো। মরার পরে তো আর ধরা পড়ার ব্যবস্থা নেই।

তাছাড়া, পৃথিবীর জীবনে যারা ভালো কাজ করে, মানুষকে সত্যের পথে ডাকে, সত্যের পথে দুঃখকষ্ট ভোগ করে, অত্যাচার নির্যাতন ভোগ করে, মানুষের উপকার ও কল্যাণ সাধন করে এবং সব রকমের অন্যায় ও দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকে, তারাও এর শুভ প্রতিফল পাবার সুযোগ না থাকলে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিফল ও পুরস্কার পাবার ঘোষণা না থাকলে তারা এসব ভালো কাজ করতোনা। এজন্যে দুঃখকষ্টও ভোগ করতোনা এবং ত্যাগ ও কুরবানীর জন্যও প্রস্তুত থাকতোনা।

এভাবে তুমি যতোই ভাববে, দেখবে মানুষের জন্যে আখিরাতের অনন্ত জীবন অপরিহার্য প্রয়োজন। এতো হলো যুক্তি। কিন্তু কারো যুক্তিতে না কুলালেও আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখলে তাকে অবশ্যি আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখতে হবে। কারণ আল্লাহ্ই আখিরাতের সংবাদ প্রদান করেছেন।

● রেকর্ডিং ব্যবস্থা

মহান আল্লাহ আল কুরআনে একথাও জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি মানুষের পৃথিবীর জীবনের সকল কাজকর্ম রেকর্ড করছেন। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের গোপন ও প্রকাশ্য সব কাজ রেকর্ড করা হচ্ছে। প্রত্যেকের কার্যক্রম রেকর্ড করার জন্য তার পেছনে দু'জন ফেরেশতা নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁরা সম্মানিত ফেরেশতা। তাঁরা হুবহু রেকর্ড করেন। একটুও কমবেশি করেননা। মানুষ গোপনে ও প্রকাশ্যে যা কিছু করে, সবই তাঁরা জানেন ও দেখেন। এমনকি মানুষ যা কিছু ভাবে ও নিয়্যত করে, তাও তাঁরা জানেন। তাঁরা ভালো মন্দ সবকিছুই রেকর্ড করেন। হাশর ময়দানে বিচারের সময় প্রত্যেক ব্যক্তির রেকর্ড তার সামনে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

> 'যে ব্যক্তি অণু (atom) পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সেখানে সে তা দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি অণু (atom) পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সেও সেখানে তা দেখতে পাবে।' (সূরা যিলযাল ঃ ৭-৮)

এই দুটি আয়াত থেকে বুঝা যায়, মানুষের সকল কার্যক্রম 'অডিও ভিজুয়াল' (অর্থাৎ যা শুনাও যায় এবং দেখাও যায়) ধরনের রেকর্ড করা হচ্ছে। আমরা যেমন টেলিভিশনের পর্দায় কারো ছবিও দেখি এবং তার কথাও শুনি,

সম্ভবত সেকরম ভাবেই শব্দ ও ছবিসহ মানুষের কার্যক্রম রেকর্ড করা হচ্ছে এবং এ রেকর্ডই সেদিন প্রদর্শন করা হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

"বিচারের সময় প্রত্যেকের রেকর্ড উপস্থিত করা হবে। তখন তুমি দেখবে, অপরাধীরা রেকর্ডের মধ্যে যা আছে, তা দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। তারা বলবে, হায় আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। কিভাবে এ নিখুঁত রেকর্ড করা হলো! আমাদের ক্ষুদ্র কি বৃহৎ একটি কাজও তো এখানে রেকর্ড হওয়া ছাড়া বাকি থাকেনি। হ্যাঁ, তারা যা যা করেছে সবই সামনে দেখতে পাবে। তোমার প্রভু কারো সাথে বিন্দুমাত্র অবিচার করবেন না। (সূরা ১৮ আল কাহাফ ঃ ৪৯)

সেদিন মানুষের হাত, পা ও চামড়াকে কথা বলার শক্তি দেয়া হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি পৃথিবীতে কি করেছে, তার হাত, পা ও চামড়া সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। পৃথিবীর মাটি থেকেও সাক্ষ্য নেয়া হবে। যমীনের উপর সে কি কি করেছে, ভূমি সেই সাক্ষ্য দেবে।

এভাবে পাপীদের অপরাধ সুপ্রমাণিত করার পরই তাদের শাস্তি (Torment) দেয়া হবে। আর ভালো লোকদের ভালো কাজ প্রমাণিত হবার পরই তাদের পুরস্কার ও শুভ প্রতিফল দেয়া হবে।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন কারো প্রতি অবিচার করবেন না। তিনি নির্ভুল সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বিচার করবেন। যদিও মানুষ কি কি কাজ করে সেখানে উপস্থিত হবে সেটা তিনি নিখুঁতভাবে জানেন, তবু তিনি বিচার করবেন সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে। এটাই সত্য ও ন্যায় বিচারের দাবি। আর এজন্যেই মানুষের সব কার্যক্রমের রেকর্ড করা হচ্ছে। কুরআনে এই 'রেকর্ড'কে বলা হয়েছে 'কিতাব'। ফার্সী ও উর্দু ভাষায় বলা হয় 'আমল নামা'।

● জাহান্নাম কি?

হাশর ময়দানে বিচার কার্য শেষ হবার পর অপরাধীদের যেখানে নিয়ে শাস্তি প্রদান করা হবে, তার নাম জাহান্নাম। জাহান্নাম একটি নিকৃষ্ট স্থান। অতি নিকৃষ্ট স্থান এটি। এটি বসবাসের জায়গা নয়, শাস্তির জায়গা। এখানে কেবল শাস্তি আর শাস্তি। শাস্তির মাঝে নেই কোনো বিরতি। এখানে রয়েছে নানা রকমের শাস্তি। একটি শাস্তি আরেকটি শাস্তি থেকে জঘন্য ও ভয়াবহ। এখানে রয়েছে–

– আগুনে পোড়াবার শাস্তি,
– উত্তপ্ত গহবরে দগ্ধ করার শাস্তি,
– পানি চাইলে উত্তপ্ত গলিত লোহা খাইয়ে দেবার শাস্তি,

– রক্ত নদীতে হাবুডুবু খাওয়ানোর শাস্তি,
– মাথায় পাথর মেরে বিচূর্ণ করার শাস্তি,
– জিহ্বা কাটার শাস্তি,
– জ্বলন্ত লৌহ্ শলাকা বিদ্ধ করার শাস্তি,
– কাঁটাদার আঠালো গাছ খাইয়ে দেবার শাস্তি,
– গলিত পুঁজ খাওয়ানোর শাস্তি এবং
– আরো বহু প্রকার কঠিন কঠিন শাস্তি।

অপরাধীরা এসব শাস্তি ভোগ করতে থাকবে, কিন্তু তাদের মৃত্যু হবে না। তারা মৃত্যুকে ডাকবে কিন্তু মরণ আসবেনা। চিরকাল তারা এখানে শাস্তি ভোগ করবে। তাদের কোনো উদ্ধারকারী, কোনো সাহায্যকারী থাকবেনা।

● জাহান্নামে কারা যাবে?

কঠিন শাস্তির এই জাহান্নামে কারা যাবে ? হ্যাঁ, এই প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে কুরআনে। আল কুরআন আল্লাহর বাণী। এ গ্রন্থে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে সেইসব লোককে, পৃথিবীর জীবনে–

– যারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে।
– যারা ঈমান আনেনি।
– যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করেও আল্লাহর সাথে শিরক করেছে।
– যারা অন্য কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়েছে।
– যারা আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করেছে।
– যারা আল্লাহর দেয়া বিধান মতো জীবন যাপন করেনি।
– যারা আল্লাহর নির্দেশ পালন করেনি।
– যারা আল্লাহর নিষেধ থেকে বিরত থাকেনি।
– যারা নিজের মন-আত্মা ও কামনা বাসনার হুকুম মতো চলেছে।
– যারা আল্লাহর ছাড়া অন্য কারো আইন মেনেছে।
– যারা মানুষের উপর নিজেদের মনগড়া আইন ও হুকুম চালিয়েছে।
– যারা আখিরাতের চেয়ে দুনিয়াকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে।
– যারা আল্লাহকে, আল্লাহর বিচার ও শাস্তিকে ভয় করেনি।
– যারা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেনি।
– যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসার জন্যে কাজ করেনি।
– যারা আল্লাহর নবীগণকে মানেনি।

– যারা আল্লাহর কিতাব মেনে চলেনি।
– যারা মুহাম্মদ সা. কে আল্লাহর নবী মানেনি।
– যারা মুহাম্মদ সা. এর আনুগত্য ও অনুসরণ করেনি।
– যারা আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থাকে বিজয়ী করা ও বিজয়ী রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেনি।

জাহান্নামে কারা যাবে, তার আরো বিস্তারিত বিবরণ কুরআনে রয়েছে। তুমি কুরআন পড়ে সেসব তথ্য জেনে নিও। হাদীসেও এর বিবরণ আছে।

● জান্নাত কি?

হাশরের মাঠে অনুষ্ঠিত বিচারে যারা আল্লাহর প্রতি নির্ভেজাল ঈমান এনে তাঁর অনুগত ও বাধ্যগত হয়ে জীবন যাপন করেছে বলে প্রমাণিত হবে, তাদের অনন্ত জীবনের আবাস হলো 'জান্নাত'। জান্নাত পরম সুখের স্থান। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে পৃথিবীতে চরম ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করে ভালো কাজ করে এসেছে, তার প্রতিফল ও পুরস্কার হিসেবে তারা জান্নাত লাভ করবে। এখানে এমন সব সুখ ও ভোগের সামগ্রী তাদের দেয়া হবে, যা পৃথিবীর জীবনে মানুষ কল্পনাই করতে পারেনি।

'জান্নাত' মানে উদ্যান। সেই উদ্যান হবে ফুলে ফলে ভরা। সেই উদ্যান হবে সৌরভে মাতানো। সেই উদ্যানের মধ্যে থাকবে জমকালো প্রাসাদ। স্বর্ণ, অমূল্য মণি-মাণিক্য ও হীরক খণ্ড দিয়ে নির্মিত হবে সেইসব প্রাসাদ। মনোরম ও মনমাতানো হবে সেইসব প্রাসাদ। প্রাসাদ ও বাগিচার নিচে দিয়ে প্রবাহিত থাকবে নানা স্বাদ ও নানা সৌরভের ফোয়ারা আর ঝর্ণাধারা।

সেখানে থাকবে সুবিস্তীর্ণ ছায়া আর ছায়া। সূর্যের তাপও থাকবেনা, থাকবেনা শীতেরও প্রকোপ। থাকবে কেবল চির বসন্ত, চির সবুজ, চির আনন্দ।

গাছে গাছে নানা বর্ণ আর নানা স্বাদের ফল থাকবে। থোকায় থোকায় ফল নুইয়ে থাকবে। সুস্বাদু পাখির গোশত, মাছের কলিজা খেতে দেয়া হবে।

মখমল ও রেশমী পোষাক তাদের পরতে দেয়া হবে। সোনার কঙ্কণ পরানো হবে। অবিরল ধারার সুসজ্জিত কক্ষসমূহে থাকবে কোমল গালিচা আর জমকালো আসন। থাকবে সেবক সেবিকা, হুর গিলমান।

যারা সপরিবারে জান্নাতে যেতে পারবে, সেখানে তারা সুযোগ পাবে সপরিবারে থাকার। সেখানে কেবল সুখ আর সুখ, শান্তি আর শান্তি, আনন্দ আর আনন্দ। সেখানে কারো দুঃখ থাকবেনা, কারো কোনো আফসুস থাকবেনা, কারো কোনো অসুখও হবেনা।

সেখানে সবাইকে চির যুবক-যুবতী করে দেয়া হবে। সেখানে কেউ বৃদ্ধ হবেনা। কারো মৃত্যু হবেনা। কারো কোনো দুর্ঘটনাও ঘটবেনা।

তুমি যদি জান্নাতে যেতে পারো, সেখানে তুমি যা চাইবে, তাই পাবে। তুমি যা দাবি করবে, সবই তোমাকে দেয়া হবে। কোনো কিছু পাওয়ার জন্যে তোমার নিজের কষ্ট করতে হবেনা। চাওয়া মাত্রই পেয়ে যাবে।

এই হলো এক আল্লাহর দাসদের প্রাপ্য। অবশ্য সে প্রাপ্য এ বর্ণনার চাইতে অনেক অনেক উত্তম আর অনেক অনেক বেশি।

● জান্নাতে কারা যাবে?

কারা যাবে এই চিরসুখের জান্নাতে? এই প্রশ্নের জবাব রয়েছে আল কুরআনে। মহান আল্লাহ তাঁর বাণী আল কুরআনে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি সেই পরম সুখের চিরন্তন জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন ঐসব পুরুষ নারী ও যুবক যুবতীর জন্যে, পৃথিবীর জীবনে যারা–

– যারা আল্লাহর সঠিক পরিচয় জেনেছে এবং তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে।
– যারা আল্লাহকে এক ও একক বলে জেনেছে এবং মেনে নিয়েছে।
– যারা আল্লাহর সাথে কাউকেও শরীক বা অংশীদার বানায়নি।
– যারা আল্লাহ ছাড়া আর সকলের খোদায়ীত্ব অস্বীকার করেছে।
– যারা কেবল এক আল্লাহর দাসত্ব করেছে।
– যারা কেবল এক আল্লাহর আইন মেনে চলেছে।
– যারা কেবল আল্লাহর দেয়া বিধান মতো জীবন যাপন করেছে।
– যারা আল্লাহর নির্দেশ পালন করেছে।
– যারা আল্লাহর নিষেধ করা সবকিছু বর্জন করেছে।
– যারা মন, আত্মা ও কামনা বাসনার দাসত্ব করেনি।
– যারা আল্লাহকে ভয় করে চলেছে।
– যারা আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে হবে বলে সতর্ক থেকেছে।
– যারা আল্লাহর শাস্তির ভয় করেছে।
– যারা বিচারের সম্মুখীন হতে হবে বলে ভীত থেকেছে।
– যারা পৃথিবীর জীবনের চাইতে আখিরাতকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।
– যারা পৃথিবীতে অহংকার ও দুষ্কর্মে নিমজ্জিত হয়নি।
– যারা জীবনের সব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে করেছে।

– যারা আল্লাহকে সর্বাধিক ভালো বেসেছে।
– যারা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে অন্য কাউকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেনি।
– যারা আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে আত্মসমর্পণ করেনি।
– যারা আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে প্রাণপণ সাধনা করেছে।
– যারা আল্লাহর জন্যে শহীদ হয়েছে।
– যারা নবীগণকে মেনে নিয়েছে এবং তাঁদের অনুসরণ করেছে।
– যারা মুহাম্মদ সা.কে আল্লাহর নবী বলে মেনে নিয়েছে এবং তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করেছে।
– যারা কুরআনকে আল্লাহর কিতাব বলে মেনে নিয়েছে।
– যারা কুরআনের বিধান মতো জীবন যাপন করেছে।
– যারা নিজেদের জীবন মৃত্যুকে আল্লাহর জন্যে ওয়াকফ করে দিয়েছে।
– যারা আল্লাহর নির্ধারিত পন্থায় তাঁর ইবাদত করেছে।
– যারা সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে চলেছে।
– যারা মানুষকে আল্লাহর পথে ডেকেছে।
– যারা আল্লাহর জন্যে মানুষের উপকার ও কল্যাণ সাধন করেছে।

পৃথিবীর জীবনে যারা এসব কাজ করবে, আখিরাতের জীবনে তারাই জান্নাতে যাবে। কুরআন পড়ে দেখো, যারা জান্নাতে যেতে চায়, তাদের কি কি কাজ করতে হবে, সবই তাতে বলে দেয়া হয়েছে।

এতোক্ষণ আমরা 'আখিরাতের প্রতি ঈমান আনার মর্ম', 'আখিরাতের প্রয়োজন কেন?' 'রেকর্ডিং ব্যবস্থা', 'জাহান্নাম কি?' 'জাহান্নামে কারা যাবে?' 'জান্নাত কি?' 'জান্নাতে কারা যাবে'- এসব উপশিরোনামে আখিরাতের একটি ছবি আঁকার চেষ্টা করেছি। এভাবে আখিরাতের ব্যাপারে সঠিক ধারণা লাভ করে আখিরাতের প্রতি ঈমান আনা আমাদের সকলেরই কর্তব্য।

● ঈমান ও ইসলাম

ঈমান সম্পর্কে তোমরা জানতে পারলে। ঈমানের অনিবার্য পরিণতি হলো ইসলাম। ঈমান হলো বীজ। আর ইসলাম হলো বীজ থেকে উৎপন্ন গাছ।

ইসলাম মানে– আনুগত্য, বাধ্যতা, হুকুম পালন ও আত্মসমর্পণ। আল্লাহ তা'আলার সঠিক পরিচয় জেনে নিয়ে, তাঁকে সর্বদিক থেকে এক ও অদ্বিতীয় মেনে নিয়ে তাঁর নবীর মাধ্যমে প্রেরিত হুকুম ও বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করে দিয়ে তাঁর একান্ত বাধ্যগত ও অনুগত হয়ে জীবন যাপন করার নামই হলো 'ইসলাম'। এমনটি যে করবে, সেই 'মুসলিম'।

মুসলিম মানে- আল্লাহর হুকুম পালনকারী, আল্লাহর অনুগত ও বাধ্যগত হয়ে জীবন যাপনকারী এবং আল্লাহর কাছে বিনীত আত্মসমর্পণকারী।

ঈমান হলো আল্লাহর সঠিক পরিচয় জানা এবং তাঁকে এক ও অদ্বিতীয় বলে স্বীকার করা ও মেনে নেয়া। আর ইসলাম হলো তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে দিয়ে তাঁর অনুগত ও বাধ্যগত হয়ে তাঁর হুকুম পালন করা এবং তাঁর মর্জিমতো জীবন যাপন করা।

সুতরাং ইসলাম হলো, আল্লাহ প্রদত্ত জীবন যাপনের বিধান। এ বিধানের মূল কথা হলো, নির্ভেজাল ঈমান এবং এক আল্লাহর দাসত্ব ভিত্তিক জীবন যাপন। এ বিধানে আল্লাহর দাসত্ব করার এবং তাঁর মর্জিমতো জীবন যাপন করার মডেল হলেন মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ সা.। তিনি যেভাবে ঈমান এনেছেন এবং ঈমান আনতে বলেছেন, তোমাকেও ঠিক সেভাবেই ঈমান আনতে হবে। তিনি যেভাবে আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব করেছেন, তোমাকেও ঠিক সেভাবেই আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব করতে হবে। তিনি যেভাবে আল্লাহর হুকুম পালন করেছেন এবং তাঁর মর্জিমতো চলেছেন, তোমাকে ঠিক সেভাবেই করতে হবে। তবেই হবে তুমি প্রকৃত মুসলিম।

মুসলিমের এই পরিচয় থেকে জানা গেলো যে, মুসলিম হতে হলে তুমি কার পুত্র? কার নাতি? কোন্ বংশের লোক? কি তোমার জাতীয়তা? তোমার বাবা মা কোন্ বিশ্বাসের লোক? তোমার আত্মীয় স্বজন কি ধরনের জীবন যাপন করে? তোমার বাবা মা, আত্মীয় স্বজন কোন্ ধর্মের লোক? – এসবের কিছুই জানার ও দেখার প্রয়োজন নেই। মুসলিম হবার জন্যে এগুলোর কিছুই প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু উপরে বর্ণিত দুইটি বৈশিষ্ট্য অর্জন করা। ঐ বৈশিষ্ট্য দুটি অর্জন করলেই তোমার পরিচয় হবে- তুমি মুসলিম। তুমি নির্মল সেনের পুত্র হও, জ্যোতিবসুর পুত্র হও, রামমোহনের পুত্র হও, সন্তু লারমার পুত্র হও, গর্ডন গ্রীনিজের পুত্র হও, জন ডেভিডের পুত্র হও, আবদুল্লাহর পুত্র হও, জিয়াউর রহমানের পুত্র হও, তোমার জন্ম উর্মিলা দেবীর গর্ভে হোক- তাতে কিছুই যায় আসেনা। তুমি মুসলিম, কারণ তুমি এক অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো এবং কেবলমাত্র এক আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য করো।

এটাই মুসলিমের পরিচয়। পক্ষান্তরে তুমি যদি আল্লাহকে না চেনো, আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় বলে না মানো, আল্লাহর হুকুম পালন না করো, তাঁর আনুগত্য ও দাসত্ব না করো এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে দিয়ে তাঁর

মর্জিমতো জীবন যাপন না করো, তবে তুমি মুসলিম হতে পারবে না। তোমার পরিচয় হবে 'কাফির' বা আল্লাদ্রোহী। এক্ষেত্রে তুমি উমরের পুত্র হও, সৈয়দ সালমানের পুত্র হও, আল্লামা আরিফুল হকের পুত্র হও, মাওলানা মারুফের পুত্র হও, মুহিউদ্দিনের পুত্রী হও, মুজিবুর রহমানের কন্যা হও, শহীদুল্লাহর নাতি হও, বদরুদ্দোজার নাতনী হও– তাতে কিছু যায় আসেনা, ঐ দুটি বৈশিষ্ট্য অর্জন না করলে তোমার পরিচয় হবে কাফির, মুসলিম নয়।

এমনকি এক্ষেত্রে যদি তোমার রেজিস্ট্রেশন, সার্টিফিকেট, আইডেন্টিটি কার্ড, পাসপোর্ট ইত্যাদিতেও তোমার ধর্ম ইসলাম বলে লেখা থাকে, তবু তুমি মুসলিম হতে পারোনা। কারণ 'মুসলিম' হলো একজন ব্যক্তির বিশ্বাস ও কর্মের পরিচয়। কেবল বংশীয় সূত্রে কেউ মুসলিম হতে পারেনা।

আরেকটি কথা বলে দিচ্ছি। সেটা হলো, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান-এসব দেশে মুসলিম শব্দের পরিবর্তে 'মুসলমান' শব্দ ব্যহার করা হয়। এটি ফার্সী শব্দ। মূল আরবি পরিভাষা হলো 'মুসলিম'।

● এসো আমরা মুসলিম হই

মুসলিম-এর পরিচয় তুমি পেয়ে গেছো। তুমি জানতে পেরেছো, আল্লাহকে চেনা-জানা-মানা এবং কেবলমাত্র এক আল্লাহর দাসত্বের মাধ্যমেই মুসলিম হওয়া যায়। অন্য কোনো পরিচয়ে মুসলিম হওয়া যায়না। সরাসরি জানা, মানা ও কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে মুসলিম হতে হয়। আমার পিতা মুসলিম, কেবলমাত্র একারণে আমি মুসলিম হতে পারিনা। আমার বিশ্বাস ও কর্ম দ্বারাই আমাকে মুসলিম হতে হবে। কাশিরামের পিতা কাফির, তাতে কিছু যায় আসেনা। কাশিরাম নিজে যদি আল্লাহকে এক বলে জানে, মানে এবং কেবল মাত্র এক আল্লাহর দাসত্ব করে, তবে সে একজন মুসলিম।

উমরের পিতা কাফির ছিলেন, কিন্তু উমর তাঁর বিশ্বাস ও কর্ম দ্বারা মুসলিম হয়ে যান। খাদীজার পিতা মুশরিক ছিলেন, কিন্তু খাদীজা তাঁর চিন্তা, বিশ্বাস ও কর্মের মাধ্যমে মুসলিম হয়ে যান। ইকরামার পিতা আবু জাহল কাফির ছিলেন, কিন্তু ইকরামা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে কেবলমাত্র তাঁরই দাসত্ব করার মাধ্যমে মুসলিম হয়ে যান। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ছিলেন ইহুদী, কিন্তু তিনি আল্লাহর সঠিক পরিচয় জেনে ঈমান আনেন এবং এক আল্লাহর দাসত্বের মাধ্যমে মুসলিম হয়ে যান। তামীম দারী ছিলেন খৃষ্টান, কিন্তু তিনি আল্লাহর এককত্ব সম্পর্কে অবগত হয়ে ঈমান আনেন এবং মুসলিম হয়ে যান।

এসো, আমরাও তাঁদের মতো জেনে বুঝে কর্মের মাধ্যমে মুসলিম হই।

● কাফির মুশরিক ও মুনাফিকরা হতভাগা

যে নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করেনা, তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভাবেনা, তার প্রতি স্রষ্টার অসংখ্য অনুগ্রহের কথা উপলব্ধি করেনা, সে অজ্ঞ। যে এই পৃথিবী ও মহাবিশ্বের সৃষ্টি সম্পর্কে ভাবেনা, সে মুর্খ। যে নিজের সৃষ্টিকর্তা, এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, মানুষের বেঁচে থাকা ও জীবন ধারণের জন্যে সীমা সংখ্যাহীন নিয়ামত সরবরাহকারী মহান স্রষ্টার পরিচয় জানার চেষ্টা করেনা, তার মতো অপদার্থ আর কে আছে?

যে ব্যক্তি জানলনা তাকে কে সৃষ্টি করেছে? কেন সৃষ্টি করেছে? স্রষ্টার প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য কি? মৃত্যুর পরে কি হবে? – এমন ব্যক্তির চেয়ে দুর্ভাগা আর কে হতে পারে?

যে স্রষ্টাকে চেনেনা, মানেনা এবং তাঁর দাসত্ব করেনা, সে কাফির। সে অকৃতজ্ঞ। সে স্রষ্টার দেয়া দেহ, অংগ প্রতংগ, চোখ, কান, নাক, মুখ, দাঁত, জিহ্বা, গলা, মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, যকৃত, ফুসফুস, কিডনী, হাত, পা, আঙ্গুলসহ অসংখ্য অভ্যন্তরীণ এবং স্রষ্টার দেয়া আলো, বাতাস, পানি, অক্সিজেন, লৌহ, ভিটামিন, প্রোটিন, শর্করা, ফল-মূল, তরু-তরকারি, মাছ, মাংস, অর্থ, সম্পদসহ সীমা সংখ্যাহীন পারিপার্শিক নিয়ামত ভোগ করছে, অথচ তাঁকে সে মানেনা, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা, তাঁর প্রতি বিনয়ী হয়না, তাঁর মর্জি মতো চলেনা– এমন ব্যক্তির চাইতে অকৃতজ্ঞ ও হতভাগা আর কে হতে পারে? সে কাফির, অকৃতজ্ঞ। তার পরিণতি খুবই খারাপ। এই কুফরী ও অকৃতজ্ঞতার জন্যে সে চিরকাল জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। সে নিজেই নিজেকে এমন খারাপ পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছে।

অন্য দিকে যে আল্লাহকে মেনেও তাঁর একত্ব ও অনন্যতা মেনে নিতে পারেনি, তাঁকে এক ও অদ্বিতীয় বলে স্বীকার করেনি এবং সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এনে কেবল এক আল্লাহর দাসত্ব করেনি, সে মুশরিক। আর মুশরিক হবার কারণে সেও কাফির। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না। কারণ, সে আল্লাহকে মানা সত্ত্বেও আল্লাহর এককত্ব (তাওহীদ)-কে মানেনি। সে জাহান্নামের জ্বালানি হবে। সেখানে সে জ্বলতে থাকবে অনন্ত কাল।

আরেক রকমের লোক আছে, তারা মুনাফিক। মুনাফিক মানে কপট বিশ্বাসী। তারা মুখে বলে তারা এক আল্লাহকে মানে, তারা মুসলিম। কিন্তু

কার্যত তারা নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করেনা, আল্লাহর দাসত্ব করেনা, আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান মতো জীবন যাপন করেনা এবং আন্তরিকতার সাথে নবীর আদর্শের আনুগত্য ও অনুসরণ করেনা। এরাও জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, এদের পরিণতিও হবে কাফির এবং মুশরিকদের মতো।

● একজন মুসলিমের কি কি কাজ?

আমরা শেষের দিকে এসে পৌঁছেছি। আমরা বুঝতে পেরেছি আমাদের একনিষ্ঠ মুসলিম হতে হবে। মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করাটাই আল্লাহর দাসত্বের পথ। যে মুসলিম সেই আল্লাহ্‌র দাস।

এখন আমাদের জানা দরকার, মুসলিম হয়ে জীবন যাপন করতে হলে কি কি কাজ করতে হবে? হ্যাঁ, তাই বলছি। আল্লাহর দাস ও মুসলিম হিসেবে তোমাকে যেসব কাজ করতে হবে, সেগুলো ছয় প্রকার ঃ

এক. তোমার নিজ জীবনের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতি এবং তোমার দেশবাসী ও বিশ্বমানবতার কল্যাণ ও উন্নতির জন্যে যা যা করা দরকার সবই করবে। নিজের ও মানবতার কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্যে কাজ করা তোমার কর্তব্য।

এ জন্যে তুমি পড়ালেখা করবে, জ্ঞানার্জন করবে, প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে, অজানাকে জানবে, গবেষণা করবে, আবিষ্কার করবে, উদ্ভাবন করবে, অভিজ্ঞতা অর্জন করবে, কাজ করবে, চাকুরি কবে, ব্যবসা করবে, উপার্জন করবে, কর্মদক্ষতা অর্জন করবে, মানুষকে ভালোবাসবে, মানুষে মানুষে সুসম্পর্ক স্থাপন করবে, শান্তি ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করবে। মুসলিম হিসেবে এগুলো তোমার কর্তব্য কাজ। এসব ক্ষেত্রে তুমি অন্যদের ছাড়িয়ে যাবে। এসব ক্ষেত্রে তোমাকে হতে হবে শ্রেষ্ঠ। বিশ্বটাকে রাখতে হবে তোমা হাতের মুঠোয়। মুসলিমের কাজ বিশ্বে পরাজিত থাকা নয়, বিজয়ী থাকা।

দুই. হ্যাঁ, তুমি ক্যলাণ ও উন্নয়নের জন্যে সবকিছুই করবে। তবে যা কিছুই করবে, যা কিছুই দেখবে, শুনবে, শিখবে, সবই আল্লাহর অস্তিত্ব, একত্ব ও সার্বভৌম কর্তৃত্বের দৃষ্টিভংগিতে করবে, দেখবে, শুনবে এবং শিখবে। এই দৃষ্টিভংগির সাথে যা কিছুই হবে সাংঘর্ষিক, যা কিছুই হবে এ দৃষ্টিভংগির বিপরীত- তা সবই অবশ্যি অবশ্যি পরিত্যাগ ও প্রত্যাখ্যান করবে। এছাড়া বাকি সবই গ্রহণ করবে।

তিন. মহান আল্লাহ তাঁর বাণী আল কুরআন এবং তাঁর রসূল মুহাম্মদ সা.-এর মাধ্যমে কিছু কাজের নির্দেশ দিয়েছেন, তুমি সেগুলো কুরআন ও হাদীস থেকে জেনে নেবে এবং অবশ্য অবশ্যি সেগুলো পালন করবে। এখানে আল্লাহর কয়েকটি নির্দেশ বলে দিচ্ছি। যেমন ঃ

১. দৈনিক পাঁচবার সালাত আদায় করা, ২. উপার্জিত অর্থ সম্পদের একটি অংশ বাধ্যতামূলকভাবে দান করা (এর নাম যাকাত) এবং সামর্থ অনুযায়ী ঐচ্ছিক দান করা, ৩. রমযান মাসে পূরো মাস রোযা রাখা, ৪. যাবার সুযোগ ও সামর্থ থাকলে কা'বা ঘরে গিয়ে হজ্জ করা, ৫. পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ এবং সুন্দর ব্যবহার করা, ৬. জ্ঞানার্জন করা, বিশেষ করে কুরআনের জ্ঞানার্জন করা, ৭. আত্মীয় স্বজনের অধিকার প্রদান করা, ৮. উত্তরাধিকার প্রদান করা, ৯. মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করা এবং সদাচরণ করা, ১০. সত্য কথা বলা, ১১. সুন্দর ও সহজ সরল কথা বলা, ১২. প্রতিশ্রুতি পূরণ করা, ১৩. সুবিচার করা, ১৪. পরোপকার করা, ১৫. মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকা, ১৬. মানুষকে সংশোধন করা ও উপদেশ দেয়া, ১৭. আল্লাহর আইন ও বিধান কার্যকর করা, ১৮. আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার জন্যে জিহাদ করা, ১৯. ভালো কাজের নির্দেশ দান করা, ২০. মন্দ কাজে বাধা দেয়া ইত্যাদি।

চার. আল কুরআন ও নবীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কিছু কাজ করতে নিষেধ করেছেন। তোমাকে অবশ্যি সে কাজগুলো ত্যাগ করতে হবে এবং সেগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে। কুরআন ও হাদীস থেকে তুমি আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজগুলো জেনে নেবে। তবে এখানে কয়েকটি বলে দিচ্ছি ঃ

১. আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং তাঁর হুকুম অমান্য করা, ২. পিতার মাতার সাথে অসদ্ব্যবহার করা, ৩. মিথ্যা বলা, ৪. প্রতিশ্রুতি ভংগ কর', ৫. কপটতা করা, ৬. প্রতারণা করা, ৭, কারো প্রতি যুল্‌ম করা এবং কারো অধিকার নষ্ট করা, ৮. ব্যভিচার করা, ৯. মানুষ হত্যা করা, ১০. আত্মহত্যা করা, ১১. সুদ খাওয়া, সুদী কারবার করা, ১২. আল্লাহর পথে জিহাদ থেকে পলায়ন করা, ১৩. মদ্যপান করা, ১৪. শুয়োরের গোশ্‌ত খাওয়া, ১৫. জুয়া খেলা, ১৬. গীবত করা, ১৭. অপবাদ দেয়া, ১৮. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, ১৯. অহংকার করা, ২০. চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক করা, ২১. অবিচার করা, ২২. ঘুষ খাওয়া, ২৩. অশ্লীল কাজ করা, ২৪. বিশ্বাসঘাতকতা করা, ২৫. মাপে কম দেয়া ইত্যাদি ইত্যাদি।

পাঁচ. মুসলিম হিসেবে তোমার পঞ্চম কাজ হলো, তুমি মানুষকে এক আল্লাহর দাসত্বের দিকে আহ্বান জানাবে। এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করে মানুষকে বুঝাবে, উপদেশ দেবে। আল্লাহর ব্যাপারে মানুষের চিন্তার বিভ্রান্তি দূর করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। সমাজে আল্লাহর আইন ও বিধান প্রতিষ্ঠার জন্যে জানমাল দিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে। এসব কাজে যা কিছু বিপদ মুসীবত, বাধা বিরোধীতা, দুঃখকষ্ট ও ও অত্যাচার নির্যাতন আসবে, সেগুলো দৃঢ়তার সাথে সইবে এবং মোকাবেলা করবে।

ছয়. মুসলিম হিসেবে তোমার ষষ্ঠ কাজ হলো, তুমি সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করবে। প্রতিটি কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে করবে। কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করবে। শুধু আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে। সব প্রয়োজনের কথা কেবল আল্লাহকে জানাবে। নিজের ভুল ত্রুটির জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, তাওবা করবে। পরকালের মুক্তির জন্যে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করবে। আল্লাহ যেসব কাজ পছন্দ করেন সেগুলো বেশি বেশি করবে। নিজেকে সব সময় আল্লাহমুখী রাখার প্রচেষ্টা করবে। পবিত্র জীবন, আদর্শ চরিত্র ও পরিচ্ছন্ন নৈতিকতার অধিকারী হবে। এসো আল্লাহর কাছে চাই ঃ

“হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তৌফিক দাও, আমি যেনো কেবল তোমারই দাসত্ব করি। আমি যেনো তোমারই মর্জিমতো চলি। আমি যেনো তোমারই অনুগত-বাধ্যগত-মুসলিম হয়ে জীবন যাপন করি। –আমীন।”

(রচনাকাল ঃ মে, জুন, জুলাই ১৯৯৯ ইং)

সমাপ্ত